:ম সংখ্যা] **কার্ত্তিক, ১৩৪১** [৭ম বর্ষ

সাল-তামামী

'শনিবারের চিঠি' সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। 'চিঠি'র জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত সময় গণনা করিলে ইহার অধিক বয়স তাহার হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছে ঠিক যতটা কাল, তাহার হিসাবে চিঠি এই কার্ত্তিকের সংখ্যা হইতে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষ্যে 'চিঠি'র পক্ষ হইতে পুনরায় কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

'চিঠি'র উদ্ভব ও তাহার পরিচালনার কিছু ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে শ্রীমান সজনীকান্ত, চিঠির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার কালে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—সে সম্বন্ধে অধিক কিছু আলোচনা আজিকার প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। তারপর গত কিছুকাল যাবৎ চিঠির সম্পাদন ও পরিচালনভার যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রধান

কৃতিত্ব এই যে, তিনি পত্রখানিকে বহু পরিশ্রমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। যাহারা এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব ও পরে ইহার প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই আর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ বজায় রাখিতে পারেন নাই। অতিশয় নবীন হইলেও অতি নিপুণ ও ক্ষমতাশালী বহু লেখক একদা 'শনিবারের চিঠি'কে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের আকাশে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক না হইলেও অতিশয় প্রেক্ষণীয় গ্রহরূপে রশ্মিময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বাংলা মাসিকের ক্ষেত্রে এমন কোনও পত্রের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহা এত স্বল্প আয়োজন ও ক্ষুদ্র আয়তন সত্ত্বেও এতখানি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছে। 'চিঠি'র আদর্শ যাহাই হৌক, তাহার মতামত যেমনই হৌক—সে বিষয়ে নানা সম্প্রদায়ের নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও, একটা কথা বোধ করি সকল নিরপেক্ষ সাহিত্য-ব্যাধিহীন পাঠকই স্বীকার করিবেন যে, চিঠি এতদিন ধরিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহার অনেক কথাই বলিবার আবশ্যক ছিল, এবং তাহা আজিকার দিনে আর কেহ বলিতে পারিত না, বা পারিলেও বলিত না। আর একটা কথাও বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিবেন—চিঠি যেমন করিয়া তাহা বলিয়াছে, তাহাতে বক্তব্যের উপরে যা বাক-নৈপুণ্য আছে, তাহা 'চিঠি'ই বলিতে পারে—অনেকে পরে তাহার অনুকরণ করিলেও সফলকাম হয় নাই। রচনার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব কোনও সাহিত্যিক পত্রিকা দাবী করিতে পারে না।

এই শক্তি ও ইহার সাফল্যের কারণ কি? সাফল্যের দাবী মিথ্যা নয়। বাংলার বহু শিক্ষিত সজ্জন (কপট সাহিত্যধর্মী দুর্জ্জনদের বাদ দিয়া) 'চিঠি'র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং তাহার অন্তরালে আদর্শ-নিষ্ঠা, রস-বোধ, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় যে পাইয়াছেন এবং পাইয়া

'চিঠি'র প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা বরাবর পাইয়াছি—বহু মনস্বী ব্যক্তি যে আজও 'চিঠি'র পাতা শ্রদ্ধাসহকারে উল্টাইয়া থাকেন, সে বিষয়েও আশ্বস্ত হইবার কারণ আছে।

সমাজের যে ভাক্ত শিষ্টাচার, যে মিথ্যা কুলচুর-অভিমান,—অসত্যের যে নানা অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে 'চিঠি' অতিশয় নির্ম্মম ও তীব্র প্রতিবাদের ভার লইয়াছে, তাহার প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, এবং দেশে এই একখানি মাত্র পত্রিকাই নির্ভীক ভাবে আজও সেই অতিশয় অপ্রীতিকর ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমালোচনার কার্য্য কোনও মতে সম্পাদন করিতেছে। এই কার্য্যে বাহির হইতে বিশেষ সাহায্য সে কোনও কালেই পায় নাই, পাইবার আশাও রাখে না। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছে—তাহা এই যে বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি 'চিঠি'র মূল মন্ত্রের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও, এ কার্য্যের ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই—'চিঠি'র নানা ত্রুটি ও দোষ প্রদর্শন মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; নির্দ্দোষ বা উৎকৃষ্টতর পন্থায় নির্ভীক সত্যভাষণের দায়িত্ব আর কেহ এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এই ঔদাসীন্যের কারণ জানি; কোনও বিষয়ে এ জাতির সাত্ত্বিক বা রাজসিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি আর নাই; চক্ষু মেলিয়া সবই দেখিতেছে, সবই বুঝিতেছে, কিন্তু কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও তুলিয়া এতটুকু প্রতিকারের উৎসাহ কাহারও নাই।

তাই বলিতেছিলাম, 'চিঠি'র অবস্থা যেমনই হৌক, ঐ একখানা কাগজই আছে, যাহাতে অপ্রিয় সত্য বলিবার মত

সাহসী লেখক কিছু লিখিতে পারেন। 'চিঠি'র লেখক গোষ্ঠী এখন আর কোনও coterie নহে—যেখানে যে কেহ সত্যসন্ধ শক্তিমান লেখক আছেন তাঁহারই সুচিন্তিত সারবান রচনা—যে রচনায় বর্ত্তমান সাহিত্য ও সমাজের নিপুণ ও নির্ভীক সমালোচনা থাকিবে—প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খরশান অস্ত্র অবশ্য সকলের আয়ত্ত নহে—সেই অস্ত্রই চিঠি'র প্রধান অস্ত্র, যথাসাধ্য সেই অস্ত্র চালনা করিয়া তৎসঙ্গে সাময়িক সমস্যা-মূলক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য এখনও চিঠি'র পৃষ্ঠা সকলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে যদি তিন চারিটিও সেরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে 'চিঠি'র অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না। যাঁহারা 'চিঠি'র আদর্শ ও মূল মন্ত্রের সহিত সহানুভূতি বোধ করেন—সেই দেশ-প্রেমিক জাতির কল্যাণকামী বহু নীরব ভাবুক ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্বকীয় সত্যচিন্তা ও নির্ভীক আলোচনা প্রকাশের জন্য 'চিঠি'র আসরে আহ্বান করিতেছি।

সাহিত্য সৃষ্টি 'চিঠি'র উদ্দেশ্য নয়—সেই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেশে পত্রিকার অভাব নাই; তৎসত্ত্বেও যে ধরণের সাহিত্য দিন দিন বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির বা সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা দুরূহ হইতেছে। 'চিঠি' অসৎ সাহিত্য বা মেকি-সাহিত্যের কঠোর সমালোচনাই একমাত্র ব্রত করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ আমরা শুনিয়াছি—তাহার জবাবও দিয়াছি। তথাপি পুনরায় এখানে কিছু পুনরুক্তি করিব। সাহিত্যকে লালন করা দরকার—কেবল তাড়না দ্বারা সাহিত্যের কল্যাণ হয় না, অতএব, 'চিঠি'র এই তাড়না হিত অপেক্ষা অধিকতর অহিত সাধন করিবে—এইরূপ উক্তি প্রায়ই আমরা

শুনিয়াছি। যে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, যাহার মূলে কোনও সুস্থ প্রেরণা নাই, যাহার পূতিগন্ধে সকল ভদ্র সামাজিক ব্যক্তি অস্থির হইয়া উঠেন—সেই সাহিত্যের স্বপক্ষে এইরূপ দাক্ষিণ্যের ওকালতি যাঁহারা করেন তাঁহাদেরই কণ্ঠরবে সাহিত্যক্ষেত্র মুখর হইলেও, আমরা বিশ্বাস করি দেশের ভদ্রমনা সাহিত্য প্রেমিক যাঁহারা—যাঁহারা মাসিক পত্রে লেখনী চর্চ্চা করিতে অপারগ বা কুণ্ঠিত, তাঁহারা এমন কথা কখনই বলেন না। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী, তাঁহারাই শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ ভাগ। শিশুকে তাড়না করা অসঙ্গত, যাহার বৃত্তি সকল পূর্ণবিকশিত হয় নাই—কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত নয়, তাহাদের সম্বন্ধেই এমন কথা সঙ্গত ও যথার্থ। কিন্তু যাহারা শৈশব উত্তীর্ণ না হইতেই অকাল-যৌবনের অহমিকা এবং কুৎসিত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে—তাহাদিগকে সময় থাকিতে উৎপাটন করাই সকল সুবুদ্ধি ও সমাজহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাংলা সাহিত্যও শিশু নহে। তাহার একটা পরিপুষ্ট ধারা বা tradition ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে—শৈশব বা অজ্ঞানের অজুহাত অথবা অতি-নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির নানা অসুবিধার হেতুবাদ এ সাহিত্যের আসরে আর চলে না। আজ যদি কেহ বাংলাভাষার ঐকান্তিক দৈন্যের অজুহাতে অতিশয় কুশ্রী ভাষার উদ্ভাবনা করে, অথবা যে ভাব বাংলা নয়, জানিয়া শুনিয়া তাহা বাংলা বলিয়া চালাইতে গিয়া পদে পদে পথভ্রষ্ট হয়, তবে তাহা শিশুর কলকাকলী বলিয়া স্নেহ-হাস্যে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।—পালন বা লালন নহে, তাহা অতিশয় সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য আর সস্তায় নাম করিবার স্থান নহে—যে মূঢ় শক্তিহীন প্রবঞ্চক এখন সাহিত্যিক যশোলাভের জন্য

কল্কেকটা আধুনিক বুলি ও বুকনির কায়দাকেই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার উপায় মনে করিয়া লোক ঠকাইতে অগ্রসর হইবে তাহাকে মমতা করিবার কোনও হেতুই নাই। নিজের শক্তির প্রমাণ দিতে হইবে। অশক্তির জন্য নানা কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। কবিশক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিভা যাহার আছে, তাহার কোনও ভয় নাই কেহ তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভারও শত্রুর অভাব হয় নাই।

'চিঠি' এপর্য্যন্ত যাহাদের উপর বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিয়াছে, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ ঘটে নাই। যে বাদ্‌লার হাওয়া দেশে এখন প্রবল তাহাতে বহু ক্ষণজীবী পতঙ্গ ক্রমাগত জন্মিতেছে—দল পুষ্টি করিতেছে—আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিতেছে। তাহাতে বিস্মিত বা হতাশ হইবার কারণ নাই। খাঁটি সাহিত্য এক্ষণে দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে—তার কারণ প্রকৃত সাহিত্যামোদীর সংখ্যা এখনও পূর্ব্ববৎ সমান অল্প হইলেও, বর্ণজ্ঞান মাত্র সম্বল অলস বিলাসীর দল এক্ষণে এত অধিক হইয়াছে, যে চাহিদার অনুপাতে, সাহিত্যরসের পরিবর্ত্তে আশু ফলপ্রদ মোদকের ব্যবসায় ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহা অনিবার্য্য। 'চিঠি' সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের অভিমান রাখে না, কেবল এই মাত্রা-রিক্ত মোদক-সেবনের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়াছে—মোদক-সেবন যাহাদের নিত্যকার অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে তাহারাও যাহাতে ইহাকে সাহিত্য বলিয়া মনে না করে, নেশা করে বলিয়া একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানহীন না হয়, তাহারই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে।

সাহিত্যের যে নূতন আদর্শ ও নীতি কতকগুলি বাচাল তরুণ ও ব্যাপিকা তরুণী, গরহজমের বুলি আওড়াইয়া সমজদার অথরিটির মত,

ট্যাশ বাংলার সাহায্যে চারিদিকে ছড়াইতেছে এবং আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া পরস্পরের পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন করিতেছে, গম্ভীরভাবে তাহার সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই—ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। আমাদের আদর্শ কি তাহাও বহু প্রবন্ধে আমরা বিশদ ভাবে বলিয়াছি। বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীর জাতীয় কৃষ্টির, ও তথা শাশ্বত সারস্বত সাধনার অপমানকারী—যে সকল লেখক সাহিত্যকেই নিজেদের দুর্ব্বল পাশব লালসা চরিতার্থ করিবার এবং সেই প্রবৃত্তি সমাজের সর্ব্বশরীরে সংক্রামিত করিবার সহজ উপায় করিয়া লইয়াছে তাহাদের প্রতি শিষ্টতা বা মমতা প্রদর্শনের প্রবৃত্তি আমাদের নাই। সে জন্য আমাদের কোনও অনুশোচনা বা অপরাধ বোধ নাই।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অস্ত্র-চালনা কালে, কোথায়ও সুরুচি অথবা ন্যায্য মাত্রার সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই—এমন অন্যায় দাবী আমরা করি না। ভুল ত্রুটি, অসংযম ও অধীরতা এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক —ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-রচনায় কিছু অভিভাষণ থাকেই। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোথায়ও অকারণ কটাক্ষপাত ঘটিয়া থাকিবে—হয় ত, কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অপ্রীতির ঝাঁজ প্রকট হইয়া থাকিবে। তজ্জন্য সাধারণভাবে আমরা অনুতপ্ত নহি; তার কারণ, আমাদের দেশে কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজ, কি সাহিত্য, সর্ব্বত্র ব্যক্তির সার্থই প্রবল— নৈর্ব্যক্তিক আচরণ—এমন কি সাহিত্য চর্চ্চাতেও—অতিশয় দুর্ল্লভ। নাম করিবার প্রয়োজন নাই, নামওয়ালাদের বিশেষ বিশেষ রচনার উল্লেখ করিবার প্রয়োজনও নাই—সাহিত্যিক মতামত পর্য্যন্ত, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও অতিশয় হীন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কিরূপ রঞ্জিত হয়—তাহা বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে অধম লেখক পর্য্যন্ত সকলেরই সম্বন্ধে সহজে প্রমাণ করা যায়। এখানে দৃষ্টান্ত দিব না—‘চিঠি’র পাঠক এমন বহু

দৃষ্টান্ত অবগত আছেন। অতএব এই অধঃপতিত সমাজে সাহিত্যের প্রসঙ্গেও ব্যক্তিগত আক্রমণ কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। ইহাতে যাঁহারা চোখ কপালে তুলিয়া শিষ্টতা ও সাধুত্বের নামে অবসন্ন হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগের সেই ভব্যতা ও মহত্ত্বের অভিনয়ে আমরা কিছু মাত্র বিচলিত হই না। যে সমাজ ভিতরে পচিয়া গলিত কৃমি-সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বাহিরের ধোপ-দুরস্ত চেহারা দেখিয়া আমরা কিছুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ করি না। মান-অপমানের কথা, সত্য ও ন্যায়ের কথা, উদারতা ও পরিচ্ছন্নতার কথা আজিকার দিনে অতি অল্প পদস্থ বাঙালীর মুখেই শোভা পায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নীচতা ও মিথ্যাচার, যে মূর্খতা ও অসাধুতার প্রমাণ আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে—তাহাতে সম্ভ্রম বা সমীহ করিবার প্রবৃত্তি আর হয় না। তথাপি ভুলক্রমে ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করা যে হয় না, তাহা বলি না; অনেক সময়ে তাহাও আংশিক বা তথ্য ঘটিত ভুল মাত্র—ব্যক্তিটি প্রকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া অনুতপ্ত হইবার কারণ প্রায় ঘটে না। আসল কথা—'ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়' যাহাকেই ধরি না কেন, দেখি তিনিও কম নহেন, আঘাতটা যেখানে পড়িবার সেখানে না পড়িয়া একটু পাশে পড়িয়াছে মাত্র। একথা আমরাও ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, লক্ষ্য আরও স্থির, এবং আঘাত কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বৈষ্ণব বাঙালী সমাজের পক্ষে আমাদের এই কার্য্যকলাপ আরও প্রীতিকর হইতে পারিত। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছি, যে আমরা শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত—লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়ের ভাবনা না ভাবিয়াই আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—আমরা যাহা তাহাই যদি না হইতাম তবে এই অতি-সাধু, অতি-শিষ্ট সজ্জন সমাজে আমরা এতদিন কোথায় মিলাইয়া যাইতাম! গুরুজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি নাই,

বন্ধুজনের প্রতি মমতা করি নাই, ভক্তগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হই নাই, স্তাবকগণের প্রতিও কোমল হইতে পারি নাই, এমন কি উপকারীজনের প্রতিও কৃতজ্ঞ হইতে পারি নাই—এমনই অমানুষ আমরা! বহুজনের বহু অভিশাপ বহন করিয়া এখনও টিকিয়া আছি; ইহাই আমাদের আশ্বাস। সম্প্রতি একজন অতিশয় রসিক ও বিদগ্ধ পাঠক আমাদিগকে 'কাপালিক' বলিয়া নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিয়াছেন. তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এই বৈষ্ণব মহাজন আমাদের অতিশয় নিরামিষ আলাপকে বলির বাজনা মনে করিয়া, একটি মেষশিশুর পত্র-চর্ব্বণ নির্ব্বিঘ্ন করিবার মানসে, আমাদিগকে অনুবিধ উপহারে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি পাক প্রণালীতে তিনিও আমাদেরই মসলা ব্যবহার করিয়াছেন—দেখিয়া আরও খুসী হইলাম, নিরামিষে আর কাহারও আস্থা নাই, পরম বৈষ্ণবও পেঁয়াজ রসুনের ভক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'জীবন দেবতা'র স্বরূপ আবিষ্কার যে বড় কীর্ত্তি, 'জীবন দেবতা' যে একটা কত বড় মৌলিক পদার্থ, এবং কাব্য সমালোচনায় এরূপ পদার্থের বিশ্লেষণ যে কত আবশ্যক তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে কবি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। তিনি যে ঋষি, কাব্যে তিনি এক অতিশয় গভীর ও মৌলিক ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি যে যাজ্ঞবল্ক্যেরই সগোত্র ইহা প্রতিপাদন করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মূল্যহীন হইবে; অতএব এই ধরণের আলোচনাকে যাহারা ছোট করিতে চায় তাহাদের দন্তরুচি, কৌমুদীর তুল্য হইলেও, তাহাদের কাব্য-রুচির প্রশংসা করা যায় না। লেখক বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ সম্বন্ধে একটি উপাদেয় ব্যাখ্যান দান করা সত্ত্বেও 'চিঠি'র উক্ত মন্তব্যকে কেন

যে বিদ্রূপসর্ব্বস্ব বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। কারণ, তাহা বিদ্রূপসর্ব্বস্ব ত নহেই বরং তাহা অতিরিক্ত Serious এমন কি sentimental হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, লেখকের সাহিত্য-বুদ্ধি নিতান্তই কেতাবী বা মাষ্টারী ধরণের হইলেও 'চিঠি'র জবাবে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা খুসীই হইয়াছি—কারণ ভদ্রলোক লিখিতে জানেন, সাহিত্যিক মতামত যেমনই হোক এমন সরস বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রচনা আমরা 'চিঠি'র উপযুক্ত বলিয়াই মনে করি।

বাহির হইতে আর একটি সাড়া আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি, তাহার সম্বন্ধেও দুই চারি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'চিঠি' যে বহু শিক্ষিত পণ্ডিত ও রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—এখনও তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় 'চিঠি'র আলোচনা-বিশেষে আকৃষ্ট হইয়া আশা ও উল্লাস প্রকাশ করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছেন—তাহা গত সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে। প্রবীণ পণ্ডিত ও সাহিত্য-সেবকের এই উৎসাহ দর্শনে আমরাও খুসী হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার আশা ও উল্লাসের কারণ তেমন কিছু ঘটে নাই, 'চিঠি' এখনও দেশের সাহিত্যিক আব-হাওয়া, রুচি ও রসবোধ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইতে পারে নাই। উল্লাস করিবার মত কোনও সুলক্ষণ এখনও সে দেখিতে পাইতেছে না। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা 'অভয়ের কথা'র সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ ও আলোচনা আমরা করিয়াছিলাম —তাহা হইতে অধ্যাপক মহাশয় আশ্বস্ত হইয়াছেন—তবে বুঝি, হাওয়া ফিরিয়াছে, একালের ছোকরা-সাহিত্যিকগণ তাঁহার সেই আদরের বস্তুর আদর করিতে সুরু করিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সে উল্লেখ ও আলোচনা যিনি করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার

মত প্রবীণ না হইলেও অতি আধুনিক নহেন—ক্ষেত্রমোহনের প্রতিভা তিনি যথা সময়েই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—একালের পণ্ডিত সাহিত্যিক সমাজে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানির নামও কেহ জানে না বলিয়াই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রমোহনের অসাধারণ রচনাশক্তির কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাই পাঠ করিয়া জনৈক অধ্যাপক (তরুণ হইলেও 'তরুণ' নহেন) সাহস করিয়া সেই গ্রন্থের সহিত তাঁহার দৈব পরিচয় ও তাহার রচনা শক্তির সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানাইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় বোধ হয় আমাদের মূল প্রবন্ধ পড়েন নাই—এই অপর একজন পাঠকের অতিশয় ক্ষীণ ও সসঙ্কোচ সমর্থন পাঠ করিয়াই স্থির করিয়াছেন, তবে বুঝি ক্ষেত্রমোহনকে এতদিন পরে বাংলার রসিক বিদ্বজ্জন চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এত সামান্য কারণে উল্লসিত হইতে পারি না—এজন্য প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয়ের এই উল্লাসে তাঁহার জন্য বেদনা বোধ করিয়াছি।

গুপ্ত মহাশয় ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাঁহার সখ্য এবং বহু পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিভার গুণগ্রাহী হওয়ার কথা, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ সহকারে জ্ঞাপন করিয়াছেন; এমন ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন—যাহা এতদিন পরে তোমরা বুঝিতেছ তাহা আমি বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম; যাই হোক এখনও বুঝিতেছ তাহাই তোমাদের সৌভাগ্য। 'চিঠি'র লেখককে একথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কোনও হেতু নাই—'মানসী'তে যখন এই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল তখনই তিনি উহার অসামান্য রচনা কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—আজও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই, উক্ত গ্রন্থখানি অমূল্যরত্ন বোধে তিনি চিরদিনই মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। এতদিন

পরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি ঐ গ্রন্থখানির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন—কেহ এমন জিনিষের আদর করিল না কেন? গুপ্ত মহাশয়ের মত এত ঘনিষ্ঠভাবে ক্ষেত্রমোহনকে জানিবার বা আরও পূর্ব্বে উক্ত রচনার রসাস্বাদ করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। একথা নিশ্চয় স্বীকার করি, তাঁহাব মত গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে উক্ত গ্রন্থের গৌরব অনুভব করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেই জন্যই 'চিঠি'র পক্ষ হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—এই গ্রন্থের প্রচার কল্পে তিনি কতটুকু সাহায্য করিয়াছেন? ছাত্রগণের দ্বারা চাঁদা তুলিয়া গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল জানি, কিন্তু সেই গ্রন্থ শহরের ফুট-পাথে এমন করিয়া আবর্জ্জনার মত পড়িয়া রহিল কেন? সুপ্রকাশিত ও প্রচারিত করিবার জন্য কি যত্ন তিনি বা তাঁহার মত অন্তবঙ্গ বন্ধুগণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে বাসনা হয়। ক্ষেত্র মোহনেব গ্রন্থ যে একালেব অনেকেই দেখেন নাই তাহাব একটা কারণ, সে গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ছাপা হইয়াছিল মাত্র। গুপ্ত মহাশয় একজন পণ্ডিত ও স্বনামধন্য লেখক, তিনি এযাবৎ কুত্রাপি এই অখ্যাত ও বিস্মৃতপ্রায় পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কোনও আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে ত পড়ে না। তাই বলিতেছি, গুপ্ত মহাশয়ের এই উল্লাসে 'চিঠি' সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চিঠির তরফ হইতে নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রসঙ্গেই অনেক কথা বলিয়াছি। কথাগুলির অধিকাংশ 'চিঠি'র মতই হইয়াছে—অর্থাৎ অশিষ্ট ও অনুদার। বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রতিবাদ স্বরূপ 'চিঠি'র উদ্ভব হইয়াছে। গত সাত বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ

'চিঠি' আপনার জ্ঞান, বিশ্বাস, আদর্শ ও রুচি অনুসারে তাহার স্বনির্ব্বাচিত স্বাধীন কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত 'চিঠি'র মত বা মনোভাব পরিবর্ত্তন করিবার কোনও কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যাত্রারম্ভে আমরা যতখানি অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, আজ যেন মনে হয় সে অন্ধকার তত নিরন্ধ্র নহে। কবিতার অবস্থা তেমন আশাপ্রদ না হইলেও বরং আরও নৈরাশ্যজনক হইলেও বাংলা সাহিত্যের যে অপর একমাত্র ফসলের ক্ষেত্র—গল্প-উপন্যাস, সেখানে কয়েকটি নূতন লেখকের উদয় ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইতেছে। বহু অপ্রিয় কথার শেষে এই উপলক্ষ্যে কিছু প্রিয়-ভাষণ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে পদ্মাপারী সাহিত্যের বিকট ভাবভঙ্গি ও তদধিক বিকট ভাষার ঘুৎকার শব্দে অতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছিলাম; মনে হইয়াছিল, পাঁচশত বৎসরের ভাষা ও তাহার রসরূপ এতদিনে বুঝি বিধ্বস্ত হইয়া গেল—আজ আশা হইতেছে বাঙ্গালী ততটা আত্মভ্রষ্ট হয় নাই, সেই ভাষার সেই সাহিত্য আর প্রসার লাভ করিবেনা। যে তরুণ আন্দোলন লইয়া এত বাদবিসম্বাদ, এত কথা কাটাকাটি হইয়াছে, তাহা যে কেবল পদ্মাপারেরই আমদানী নয় তাহা জানি, কিন্তু সাহিত্যে যে যথেচ্ছাচার যে আত্মঘাতী পরানুকরণ ও ভাষার উৎকর্ষ রূপ সেই আন্দোলনে প্রকট হইয়াছিল তাহা যে মুখ্যতঃ পদ্মাপারের আমদানী তাহাও অস্বীকার করা যায় না। রসিকতা যাহাদের সহজধর্ম্ম নয়, বাঙ্গালী-চিত্তের রস-বাহিণী ভাষা যাহাদের পক্ষে বিভাষা, তাহাদেরই হাস্যকর সাহিত্যিক স্পর্দ্ধা দেখিয়া একদিন সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"রসের কুঞ্জে

চাষ দিতে আসে পদ্মাপারীর দল!" কবি বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতে পাইতেন—এই দুর্দ্ধর্ষ পদ্মাপারীর দল, বসের কুঞ্জে শুধু চাষ নয় গোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে; এবং কলিকাতার সাহিত্য পণ্যশালায় তাহারা সেই গব্যবস্তুর প্রচলন প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, এখানকার ক্ষুদে তরুণেরা সেই একই পালে মিশিয়া গোষ্ঠ গ্রহ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভয় হইয়াছিল, বুঝি, চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণ হইতে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধন এই ভাষা—ভাষার অনুবন্ধী ভাব-রস-মূর্চ্ছনার লোপ পাইল, তাহার পরিবর্ত্তে ভাষা ও ভাবের কুৎসিত ফিরিঙ্গিয়ানা আধুনিকত্বের দোহাই দিয়া বঙ্গ সরস্বতীর দম বন্ধ করিল। কিন্তু তাহা যে হইতেই পারে না, এ জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে—বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী, পড়িয়া তাহার প্রমাণ পাইলাম। সাহিত্য যে কি বস্তু তাহার প্রেরণা কোথা হইতে আসে, এবং তাহার প্রকাশই বা কি যথাযথ ও সুন্দর লিপি কৌশলে সার্থক হইয়া উঠে, তাহা ফেরঙ্গ সাহিত্যিকদিগের ব্যাধি বিকৃত বুদ্ধির অগম্য—বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসখানির মত সত্যকার সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন আজিকার এই অতিআধুনিক সাহিত্যে সেই প্রথম, যাঁহারা সাহিত্যরসরসিক,—প্রগতিবাদী বুকনি-বিলাসী নহেন—তাঁহারা ফুলচুরী-সাহিত্য চর্চ্চার সহিত এই বহিখানির ভিতরকার রসদৃষ্টি ও বাহিরের প্রকাশভঙ্গি তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন—খাঁটি সাহিত্য-প্রেরণা কাহাকে বলে, এবং এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে বাংলাসাহিত্যের পদ্মাপারী ঢং একটা জোরজবরদস্তি মাত্র—উহা আত্ম-ভ্রষ্ট, উহার আস্ফালন আপনিই নিবৃত্ত হইবে। তথাপি একজন লেখকের একখানি মাত্র পুস্তকের উপরেই আশাভরসা নির্ভর করে না। তাই আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ আরও কয়েকটি শক্তি-

শালী লেখকের অভ্যুদয়ে—বিশ্বাস ফিরিয়াছে। নবীন লেখক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ও সরোজ রায় চৌধুরীর রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—উভয়েই সুলেখক; মনোজ বসুর রচনা কাব্যপ্রধান হইলেও বিশিষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। তারাশঙ্করের লেখার সহিত পরিচয় হইয়াছে আরও পরে; কিন্তু ক্রমশঃ আমি তাঁহার শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি। ছোট গল্পের আর্ট তাঁহার আশ্চর্য্য বাস্তবপ্রীতি ও রসদৃষ্টির গুণে বাংলাসাহিত্যে একটি নূতন সম্পদ যোজনা করিবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। খাঁটি বাংলা উপাদানে তিনি গল্পসৃষ্টির যে নিগূঢ় কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন—অতিশয় বাস্তব বস্তুকেই নিটোল রসকল্পনার অধীন করিবার, জীবনকেই আর্টের বিষয়ীভূত করিবার যে নৈপুণ্য তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আশা হয় তিনি বাংলা ছোটগল্পকে উৎকৃষ্ট বিদেশী গল্পের সহিত একাসনে বসাইতে পারিবেন। 'শনিবারের চিঠি'র তরফ হইতেই নয়—আমি বাংলা সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

আর একজন অতিশয় তরুণ লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করিলে অতিশয় অন্যায় করা হইবে। ইনি শ্রীমান মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিবার সময় আসে নাই—আশা করি যখন সে সময় আসিবে তখন দেখা যাইবে যে দৃষ্টিভঙ্গি, কল্পনা ও প্রকাশরীতির মৌলিকতায় তিনি বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র আসন পাইবার উপযুক্ত, হয় ত যে আধুনিকতার জন্য আমরা এত উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাঁহার রচনায় সেই আধুনিকতা সত্যকার প্রতিভাযুক্ত হইয়া অতি-আধুনিক ও শাশ্বত-সনাতনকে

বিরোধমুক্ত করিবে। এই বালকের রচনায় রসকল্পনার সহিত যে আশ্চর্য্য মনস্বিতার সমাবেশ লক্ষ্য করিতেছি তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তথাপি, তাঁহার রচনায় এখনও নিটোল-কল্পনা বা খাঁটি সৃষ্টিশক্তিব পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই—এখনও পূর্ণ রসদৃষ্টির অভাব আছে। আশা করি বয়সের সঙ্গে দৃষ্টির সেই পূর্ণতা লাভ ঘটিবে—অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে তিনি কলঙ্কমুক্ত করিবেন।

মাসের পয়লা

নিজেরে বুঝায়ে বলি—ওরে শোন শোন
এ যে তোর সৃষ্টিছাড়া পণ!
নাগালেতে নাই যাহা কেমনে তা পাবি—
এ যে তোর অসম্ভব দাবী।
ঘন গাঢ় দানাদার খাঁটি ভালবাসা
পেতে তোর আশা।
তুই চাস্, পৃথিবীর জীবন-যাপন
হোক্ শুধু একখানি রাগিণীর মধু-আলাপন!
একখানি বিবাহ করিয়া
'রোমান্স' করিতে চাস্ জীবন ভরিয়া!

তুই চাস্, তুহার বনিতা,
নানাবিধ করিয়া ভনিতা,
কখনও প্রেয়সী বেশে,—কখনও বা পাচিকা সাজিয়া
হিসাব রাখিয়া কভু, কখনো বা বাসন মাজিয়া,
জীর্ণ দেহটারে তার ইক্ষুসম নিঙাড়িয়া দিক্!
কখনো বা ফুর্সৎ মাফিক
গাহিয়া নাচিয়া
নিত্য তোর চিত্ত হতে ফেলুক চাঁছিয়া
সর্ব্ববিধ সকল ময়লা!
মাহিনা মিলেছে আজ মাসের পয়লা,
সুতরাং ঝোলা গোঁফে তা'দিয়া দুবার,
মানি আমি, চিত্ত তোর হয়েছে দুর্ব্বার
চন্দ্রালোকে,—ক্ষণিক উচ্চাশে
সফেন উচ্ছ্বাসে!
এও মানি হায়,
দু' 'পেগ্' টানিলে পরে—(বিশেষতঃ পরের টাকায়!)
মন হয়ে ওঠে 'দিল্'—চক্ষু হয় 'আঁখি'
রঙীন-কাপড়-পরা যে-কোনো রমণী হয় সাকী
আপনারে মনে হয় যেন কোন অবজ্ঞাত hero!
হিট্‌লার, মুসোলিনি, নাদির চেঙ্গীজ কিংবা Nero,
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু,
মনে হয় মোর কাছে নাবালক শিশু!
প্রাণ মোর আকাশেতে উড়ে যেতে চায়,
যে আকাশে হায়—

সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নাই গ্রহ-তারা,
কেহ নাই শুধু আমি ছাড়া !
কিন্তু হায় বৃথা তুই মরিস্ কাঁদিয়া
দড়াদড়ি দিয়া তোরে রেখেছে বাঁধিয়া !
মনে হয় আমি যেন কারারুদ্ধ মহাত্মা-বিশেষ
অকারণে সহিতেছি ক্লেশ !
অন্তরস্থ ভুখা ভগবান
মাগে পরিত্রাণ !
পাছে করে পলায়ন, চারিদিকে তাই
দারা-পুত্র-পরিজন, মাসি, পিসি, ভাগিনা ও ভাই
সারি সারি রচিয়াছে ব্যূহ !
ভুলে যাই আমি সেই কেনারাম গুহ
কাজ করি 'মেকেঞ্জি লায়েলে'
সাহেব ধমকায় মোরে ন'টায় না এলে !"
বুঝায়ে মনেরে বলি—"বুঝি আমি সব
কিন্তু ওরে যাহা অসম্ভব
হয় তাকি কভু ?"
মৌন রহি ক্ষণকাল, মন বলে, "বুঝি সব ; তবু—!"
সুতরাং বল্গা আলগা করি কল্পনার
গিরি দরি মাঠ বন হইলাম পার।

*   *   *

নন্দন কাননে বসি কোলে করি উর্ব্বশী
শুঁকিতেছিলাম পারিজাত ;

অপ্সরীরা গাহে গান মন্দাকিনী কলতান
ধীরে ধীরে করে তারি সাথ !
উর্ব্বশী হাসিয়া কহে, "ওহে সখা কহ ত হে
পদ্মার ইলিশ মাছ নাকি
সুধা হতে মিষ্টতর তা হতে উৎকৃষ্টতর
নাই কোনো কীট পশু পাখী !
সুতরাং খেতে চাই —কহ, নাথ, কোথা পাই ?"
শোনামাত্র তখনি ছুটিয়া
শিয়ালদহতে গিয়া ভাল দুটি মাছ নিয়া
নিজ হস্তে দিলাম কুটিয়া !
মেলি কুন্দ-দন্ত-রাজি উর্ব্বশী ফেলিল ভাজি',
মেনকা ও রম্ভারে ডাকিয়া
প্রেম-গদগদ-মুখে খাইতে লাগিল সুখে
রসাবেশে চাখিয়া চাখিয়া।

*   *   *

সহসা রম্ভা তুলিলেন সুর,
"আমি প্রিয়তম খাব চানাচুর,
কখনো খাইনি, এ দুঃখ দূর
কর গো !
টানি পুনরায় পিরীতির জের !
কিনিয়া আনিয়া চানাচুর ফের
কহি রম্ভারে "তব দুঃখের
অবসান হোক্—ধর গো !"

*   *   *

মেনকা কহিল সলাজ হাসিয়া
আমি যাহা চাই দিবে কি ?
আপনারে আমি দিতে চাই সখা
নিবে কি ?
স্নেহে ও সোহাগে নিজেরে ছানিয়া
দিতে চাই তব চরণে আনিয়া
বঙ্গদেশের হে মহামানব
হে ব্রহ্মচারী বিবেকী !
—মোরে নিবে কি ?

* *

চুম্বন করিয়া মোরে মেনকা সুন্দরী
বারম্বার কর্ণমূলে কহিল গুঞ্জরি
হে বাঙালী,
আমি ভিখারিণী তব—প্রেমের কাঙালী !
ফিরায়ো না, লহ সখা, রাখ মোরে পায়ে
সহসা হইল মনে মেনকার গায়ে
কুকুরের গন্ধ কেন ছাড়িছে বেজায় !
কাছে টেকা দায় !
······আরে মোলো,—গোঁফ চাটে কেন ?
প্রণয়ের নিদর্শন হেন
মেলেনি কোথাও !
"পাপিয়সী,—দূরে সরে যাও"
বলে সেই মেনকারে ঠেলে দিনু দূরে
কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—সকরুণ সুরে
স্বপন টুটিল মোর ;—দেখিলাম হায়
পড়ে আছি একেবারে ড্রেনের তলায় !

—"বনফুল"

প্রসঙ্গ কথা

বৎসরে বাঙালী হিন্দুদের নিকট বিজয়াদশমী একটি মাত্র শুভ দিন, যে দিন গৃহস্থ, চোর এবং পুলিস পরস্পর কোলাকুলি করিতে পারে। এই পরমানন্দের দিন পরম শত্রুকে পরম মিত্র বলিয়া অনুমান করিতে হয়, এবং বিদেশী কারবাইড এবং মোটরের তেল পুড়াইয়া হৈ হৈ করা সার্থক মনে হয়। কাহার পূজায় কত বেশি খরচ হইল এবং কাহার দলের বাদ্য কত বেশি জোরে বাজিল ইহার উপর পূজা অনুষ্ঠানকারীর ভক্তি এবং তৃপ্তি নির্ভর করে। কিন্তু যাহারা পূজা করে না তাহাদের ঐ বিজয়াদশমীই সম্বল। আড়াই ধাক্কা পরিমিত বিজয়ার বহুআলিঙ্গনে রোগী স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, বহুগুরুজনের চরণে মাথা নোয়াইতে নোয়াইতে কোমরের বাত সারে এবং বহুজনের শুভেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আলিঙ্গন এবং পদধূলি গ্রহণ একাধারে ডন-বৈঠকের ভিন্ন মূর্ত্তি। বিজয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত একমাস উক্ত কার্য্যের জের চলিতে থাকে। বহু বাঙালী বিজয়া দশমীতে হাতে খড়ি দিয়া পরে বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

অন্যদিকে কোলাকুলি দ্বারা দাদ খুজলি এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হইবার প্রেরণা লাভ করে। একজন যক্ষ্মারোগীর আলিঙ্গনে একাধিক জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সুযোগ পায়, এবং নোংরা পোষাক সম্বলিত আলিঙ্গনপ্রার্থীকে আলিঙ্গন দিবার সময় দম বন্ধ করিয়া থাকিতে

থাকিতে প্রাণায়ামের পথে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যায়। মায়ের বিদায় উপলক্ষে বহু সন্তান সিদ্ধি এবং মদ্য পান করিয়া থাকে, ইহাতে আবগারী বিভাগের আয় বৃদ্ধি হয়, এবং ডাকে বিজয়ার প্রীতি ভালবাসা আদানপ্রদানেব দ্বারা ডাকবিভাগও লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হয় না। দেখা যাইতেছে, পূজা উপলক্ষে স্বদেশ এবং বিদেশ উভয় দেশেবই লাভ, সুতরাং বর্ষে বর্ষে বিজয়াদশমী ফিরিয়া আসুক আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা কবি।

* * *

পেঁয়াজ এবং সিনেমাসংবাদ আমাদের দেশে একই প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে। সাপ্তাহিক পত্রিকারূপ ব্যঞ্জনে সিনেমাসংবাদরূপ পেঁয়াজ দিলে পত্রিকা মুখবোচক হয়, না দিলে বিস্বাদ হইয়া যায়। এই ব্যঞ্জনের ভোক্তা অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র। কোন অভিনেত্রী দিনে কয়বার মুখ ধোয়, কাহার কয়টা কুকুর আছে, কে বৌদ্র ভালবাসে, কে সাঁতাব ভালবাসে, কে কয়ঘণ্টা ঘুমায়, কাহার কয়টা সন্তান, কাহার কত বাব বিবাহ হইয়াছে এই সব মূল্যবান সংবাদ। গ্রেটা গার্বোর গোপন খবর, এলিসা ল্যাণ্ডির বংশ পরিচয়, মারলেনের স্বামীর নাম, মে ওয়েষ্টের দৈহিক ওজন—অর্থশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে মুখস্থ রাখিতে হয়। যে ছাত্র সিনেমার খুঁটিনাটি খবর জানে না সে আধুনিক নহে, এবং ছাত্র সমাজে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। ছাত্রের অভিভাবককে এখন শুধু থাকা খাওয়া এবং পড়ার খরচ জোগাইলেই হয় না, সিনেমা এবং সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রী সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য, মাসিক অন্ততঃ দশ পনের টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। এত কাণ্ড

করিয়াও ছাত্র পরীক্ষা পাস করে। কিন্তু এই কৃতিত্বের অনুপাতে মাসে দশ পনের টাকা কিছুই নয়।

*   *   *

খুব অল্পদিনের মধ্যে অলঙ্কার এবং কলের গানের দোকানে কলিকাতার রাজপথগুলি ভর্ত্তি হইয়া গেল। সোনা যখন ৩৫ টাকা তোলা ঠিক সেই সময়েই অলঙ্কারের বাহুল্য বৃদ্ধি হইল কেন? বাঙালীর পক্ষে হঠাৎ এরূপ ব্যাপকভাবে সঙ্গীতরসিক হইয়া উঠিবার কারণও আলোচনার যোগ্য। প্রথমটির কারণ সম্ভবত এই—সোনার দাম বাড়িয়া যাওয়াতে খুব শস্তায় গহনা প্রস্তুতের উপায় বাহির হইয়াছে, সেইজন্য সোনা ছাড়িয়া মহিলাগণ রূপার অলঙ্কার পরিতেছেন। বাঙালী মহিলা পূর্ব্বে শত শত টাকা মূল্যের সম্পত্তি সর্ব্বাঙ্গে বহন করিতেন (এখনও সুযোগ পাইলেই করেন) কিন্তু সোনা মহার্ঘ হওয়ায় রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মূল্যবান জিনিসের মূল্য যখন কেহ দিতে পারে না, তখনি অবহেলিত বস্তু মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ফাঁকিকেও তখন লোকে অবলম্বন করিতে দ্বিধা করে না। গণতন্ত্রের নামেই হউক বা আধুনিকতার নামেই হউক শস্তা জিনিস একবার লোকের মন ভুলাইতে পারিলে শস্তার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য। গানও খুব শস্তা হইয়া উঠিয়াছে। 'মিউজিক' কাহাকে বলে তাহা "মিউজিক বিফোর মস্ক্"এর যুগে একবার আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। এ যুগের মিউজিক সেই মিউজিকেরই অভিব্যক্তি। "শহরময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

সাধনাবিহীন সিদ্ধিরও গৌরব আছে—অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়া তাহার মূল্য সামান্য নহে। তাই আমাদের দেশে নিত্য নূতন শস্তা

জিনিসের আবির্ভাব ঘটিতেছে। যাঁহারা ভাল জিনিস সস্তায় দেন তাঁহারা ঠকেন, কেন না এ দেশে লোকে কেবল শস্তাই খোঁজে জিনিস ভাল কি মন্দ তাহার খোঁজ লয় না।

* * *

বাঙালীর ব্যবসা বলিতে সৌখীন জিনিসের ব্যবসাই বুঝায়। ইহাতেই তাহার হাত পাকিয়াছে বেশি। ইহা ছাড়া যাহাতে শারীরিক পরিশ্রম আছে এরূপ ব্যবসা অধিকাংশই অবাঙালীর হাতে। ইহার জন্য তাহাদের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই, কেননা ক্রোধ একটা রিপু এবং উহাতে মানুষের ক্ষতি হয়। যাহার যেটুকু ক্ষমতা সে তাহাই করিতেছে। বাংলা দেশে মাড়োয়ারী না আসিলে অন্য কোনো অবাঙালী আসিত, কেননা সে যাহা পারে বাঙালী তাহা পারে না, পারিলে মাড়োয়ারীর আসিবার দরকার হইত না।

বাঙালীর উৎপাদনী প্রতিভাও তেল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতিতে আবদ্ধ। একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রসাধন দ্রব্যের কারখানা হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের মূলধন প্রচুর তাঁহাদের সঙ্গে অল্প পুঁজি লইয়া প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি কেন? সাহিত্যের কারখানাও দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যাইতেছে! সুখের বিষয়, এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন বড় একটা উঠে না, কারণ একই জিনিস কেহ বার বার কেনে না। প্রতিযোগিতা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে। স্কুলগুলি বৎসরে একবার করিয়া প্রকাশকদের দ্বারা অতি ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। রেজিষ্টার্ড আন-রেজিষ্টার্ড প্যাকেট তীরের মত চারিধার হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

ফলে স্কুল বিনামূল্যে বহু পুস্তক লাভ করে, কিন্তু ইহাতে প্রকাশকদের কতখানি লাভ হয় তাহা তাঁহারাই জানেন!

* *

বাঙালীর পেটেন্ট্ ঔষধরূপ আর একটি সৌখীন দ্রব্যের ব্যবসা আছে। পেটেন্ট ঔষধ সৌখীন দ্রব্যের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। কারণ বিজ্ঞাপন পড়িলেই লোকের অসুখ আছে বলিয়া ধারণা হয় এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ খাইবার সখ চাঙ্গা হইয়া উঠে। অসুখ হইলে চিকিৎসকের নিকট যাইবার প্রয়োজন হয় না—যে যত ভাল বিজ্ঞাপন লিখিয়া লোককে বশ করিতে পারে তাহার তত বিক্রি। যাহার চৌদ্দ পুরুষে চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু জানে না তাহার ঔষধও ঔষধ। এই ঔষধের ফরম্যুলা স্বপ্নে পাওয়া যায়, সন্ন্যাসীর নিকট হইতেও পাওয়া যায়। কবচও ঔষধ। লোকের ভক্তি নষ্ট হয় না; বলে, হোক ফাঁকি, বিশ্বাস থাকিলেই সারিবে। বিশ্বাস করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে তাহাদের উন্নতি একদিন হইবেই। কিন্তু বাঙালী একটি সৌখীন দ্রব্যের ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। থিয়েটারের অবস্থা কলিকাতায় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এবং যদিও সিনেমার ছবিগুলিও ভৈখবচ তবুও অল্পখরচে এবং অল্প সময়ে দেখা যায় বলিয়া লোকে আপাতত রক্তমাংসের জীবকে অগ্রাহ্য করিয়া ছায়াচিত্রেরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। সিনেমার আর একটি সুবিধা এই যে একই বই পাঁচবার পাঁচ রকম হয় না ঠিক একই রকম হয়, লোকে নিশ্চিন্ত মনে দেখিতে পারে। কোনো নায়ক হঠাৎ অসুস্থ হইয়া ছবি হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

* * *

সিনেমার যে টেকনিক হলিউডে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একটা বিরাট সাধনা রহিয়াছে, আমাদের দেশীয় টেকনিকের পিছনে তাহা নাই। কোনো টেকনিক আছে বলিয়াই মনে হয় না। আছে অর্দ্ধশিক্ষিতের ছেলেখেলা। সাধ আছে সাধনা নাই, তাই সৃষ্টি হইতেছে না। সিনেমা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি জিনিস আমেবিকার প্রস্তুত। তাহারাই ক্যামেরা প্রজেক্টব তৈয়ারী করিয়াছে, তাহারাই ফিল্ম তৈয়ারী কবিয়াছে। সুতবাং তাহারা দেশের পয়সা দেশে রাখিয়া পরীক্ষা কবিতে পারিয়াছে, এবং বহু ব্যর্থতার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিযাছে। হলিউডের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি যেন যন্ত্র নির্ম্মিত কোথায়ও কোনো খুঁৎ নাই। ইহা দেখিয়া ভাল ছবিব ধারণা করিতে এবং তাহা প্রস্তুতের কৌশল আয়ত্ত করিতে যে কোনো বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের বেশিদিন লাগিবাব কথা নহে। কিন্তু আজ পনের ষোল বৎসরের চেষ্টাতেও যাহা হইল না অদূর ভবিষ্যতেও যে তাহা হইবে এরূপ মনে করা যায় না। এমন একখানি ছবিও হয় নাই যাহা বিদেশে দেখানো যায়। ভাল হইলে বাংলা ভাষার তোলা ছবিও বিদেশে চলিতে পারে। ভাষা কোনো বাধাই নহে। ব্লু এঞ্জেলের মত ছবির যদি জার্মান সংস্করণ আমরা দেখিতাম তাহা হইলে জোর করিয়া বলিতে পারি জার্মান ভাষা না জানা সত্বেও ছবিখানি বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার পক্ষে আমাদের কোনো বাধাই হইত না। ভাষার বাধা নাই কিন্তু চরিত্রের বাধা আছে। যে চরিত্রে কল্পনা নাই, সৌন্দর্য্য বোধ নাই, সংযম নাই, গভীর সাধনা নাই, তাহার দ্বারা আর যাহাই হউক সৃষ্টিমূলক কোনো রচনা হইতে পারে না।

* * *

কিন্তু তবুও যাহাই হইতেছে তাহাই বিক্রয় হইতেছে। ইহা মন্দের ভাল। কতকগুলি দেশী লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে, এবং লাভের কিছু অংশ দেশেই থাকিতেছে। ক্যামেরা প্রজেক্টর ফিল্ম প্রভৃতি এদেশে না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্তত ফিল্ম প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহাকে স্বদেশী বলা চলিবে না। কাপড়ের কল বিদেশ হইতে আসে, কিন্তু তূলা ভারতবর্ষের, মুদ্রাযন্ত্র বিদেশী কিন্তু টাইপ স্বদেশী। সিনেমা ব্যবসাতে তেমনি ফিল্ম অন্তত ভারতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * *

বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা যে সর্ব্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ একথা আমরা সকলেই জানি। আজ পর্য্যন্ত আমরা য়ুরোপীয় জাতি হইতে শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসাবে নিজেদের মধ্যে পরিচিত এই কারণে যে আমাদের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞই বেশি, বিশেষজ্ঞ কম। এমন কি নাই বলিলেই চলে। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ, সে একই জগতে বাস করে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের বিচরণক্ষেত্র সর্ব্বত্র। আমাদের দেশে যে এক প্রকার সর্ব্বসিদ্ধি কবচ বিক্রয় হয় তাহার সঙ্গে আমাদের সর্ব্বজ্ঞতার তুলনা করা যাইতে পারে। একটি মাত্র কবচ-ধারণে সর্ব্ব বিষয়ে ইষ্ট হয়। মোকদ্দমায় জয়লাভ, পরীক্ষা পাস, অর্থোপার্জ্জন, লোক বশ করা, যে কোনো বিপদ হইতে মুক্তি লাভ, শত্রু ক্ষয়, বন্ধু লাভ—কিছুই বাদ যায় না। যিনি কবচ বিক্রয় করেন তিনি নিজে বোধ হয় উহা ধারণ করেন না। কিন্তু নিজে ধারণ করিয়া ধনশালী হইবার পর সেই ধন দেশের মধ্যে বিলাইয়া দিলে কত সহজে লোকের কল্যাণ হইতে পারে, অথবা এক টাকা পাঁচ সিকার ভি. পি. গুণিয়া গুণিয়া জীবন কাটাইতে হয় না! কিন্তু ইহাকেই বলে স্বার্থত্যাগ।

* * *

যাহা হউক এই কবচ এবং বাঙালীচরিত্র প্রায় সমতুল্য। বাঙালী দায়ে পড়িয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছে। বাঙালী ডাক্তার সর্ব্বরোগের বিশেষজ্ঞ—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। বি-এস-সি, এম-এ, এম-বি, বি-এল, কবিরত্ন কবিরাজ দেখিয়াছি। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ এবং বি-এল ওকালতী করেন, লাইফ ইনশিওরেন্সের এজেন্সী করেন এবং সন্ধ্যাবেলা হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে পড়িতে পুলিসের চাকুরী গ্রহণ এবং পরে তাহা ছাড়িয়া পাটের দালালি করিতে দেখিয়াছি। ষ্টেজে অঙ্গভঙ্গি করা শিখিয়াই সিনেমা-ডিরেক্টর হইতে কালবিলম্ব হয় না। মোটকথা যে-কোনো বাঙালী যে-কোনো কাজেই লাগিয়া যাইতে পারে—কেবল ইচ্ছা হইলেই হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকা হইতে 'হাইজীন' এবং 'সিভিক্স' তুলিয়া দিয়া কলিকাতার রাস্তায় আরো পুলিস বৃদ্ধি করা আবশ্যক। হাইজীন এবং সিভিক্স-এর জ্ঞান এদেশে কখনই হইবে না। বাড়ির দ্বিতল ত্রিতল হইতে দিনরাত গাড়িঘোড়া লোকজনকে অগ্রাহ্য করিয়া পথের উপর নির্ব্বিকার ভাবে আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পানের রঞ্জিত পিক কত জনের জামা কাপড়ে পড়ে, কাহারো মাথায় ভুক্তাবশেষ মুড়ি, কাহারো মাথায় তরকারীর খোসা, কাহারো মাথায় মাছের আঁইস! ইহার চেয়েও গুরুতর নোংরা জিনিস পতিত হয়। সদর রাস্তার উপরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া "কমিট নো নিউস্যান্স" নীতির বাপান্ত করা হয়। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, রক্ত-মাখা [illegible]কড়া, পুঁজমাখা তুলা, ব্যাণ্ডেজ, মরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর সমস্তই সদর পথে নির্ব্বিকার ভাবে পড়িয়া থাকে। কর্পোরেশনের

ব্যবস্থার ত্রুটি আছে একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু কলিকাতার নাগরিক নিজের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নষ্ট করিয়া এই বীভৎসতার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কর্পোরেশনের নিকট কখনই দাবী উপস্থিত করিবে না। এই বিভাগটি পুলিসের হাতে না যাওয়া পর্য্যন্ত খুব সম্ভবত পথ যাত্রীর শিরে এই সমস্ত সমভাবেই নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং কেহ ইহার কোনো প্রতিবাদ করিবে না।

* * *

পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ বলিয়া বাঙালী কুলিমজুরের কাজ করে না, ভোরে উঠিতে কষ্ট হয় বলিয়া বাঙালী-ফেরিওয়ালা খবরের কাগজ ফেরি করে না, মূলধনের অভাবে ব্যবসা করিতে না পারিয়া চাকুরি করে ইহা বুঝি। কিন্তু কোনই কষ্ট নাই, কেবল চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া বিনামূলধনে যে একটি উৎকৃষ্ট ব্যবসা করা যায়, সে ব্যবসাটি বাঙালী কেন করে না তাহা বুঝি না। এই কলিকাতা শহরে শত শত ভিন্নপ্রদেশীয় জ্যোতিষী এবং গণৎকার কপালে তিলক কাটিয়া, গলায় মালা ঝুলাইয়া কতকগুলি কাগজ লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথপার্শ্বে বসিয়া আছে। ব্যাকুলতা নাই, চপলতা নাই,— অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন, নির্ব্বিকার আসন। কেবল আনত চক্ষু পল্লবের আড়ালে চক্ষুগোলক শিকার সন্ধানে পূর্ব্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণে ঘন সঞ্চারিত, ঊর্দ্ধ অধঃ তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক যে চক্ষুর্দ্বয় লইয়া আমাদের এত গৌরব, যাহার ১৮০ ডিগ্রী দৃষ্টিক্ষমতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা সদা তৎপর তাহার সত্যকার কার্য্য-ক্ষমতা যে সাড়ে বাইশ ডিগ্রী মাত্র ব্যাপ্ত ইহা ত এই গণৎকারগণ প্রমাণ করিতেছে। তবু বাঙালীর দেখা নাই! কে

ক্ষীণদৃষ্টি বাঙালী জলে চীৎ হইয়া দুই তিন দিন ভাসিয়া থাকিতে পারে, সে যে ফুটপাথে বসিয়া হস্তরেখা গণিয়া লোকের ভবিষ্যৎ বাৎলাইয়া দুই পয়সা রোজকার করিতে পারিবে না ইহা বিশ্বাস হয় না। বাঙালী গণৎকার ঘরে বসিয়া বনিয়াদি চালে প্রকাণ্ড ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সাহায্যে ব্যবসা করে বটে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কম। বিজ্ঞাপন দিয়া কয়জন ক্রেতা পাওয়া যায়? যাহারা পথে বসিয়া ভাগ্য গণনা করে তাহারাই ত জনগণমনঅপহারক "ভাগ্য"বিধাতা। ইহা ছাড়া ইংরেজি বলিতে পারে এরূপ দুষমন জাতীয় চেহারার পাঞ্জাবীগণৎকার জোড়ায় জোড়ায় প্রতি বাড়িতে ফেরি করিয়া বেড়ায়। অনেকে তাহাদের চেহারা দেখিয়া ভয়ে হাত দেখায়। এ অবস্থা বাঙালীর হইবে না, কিন্তু শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া, গেরুয়া বস্ত্রে মাল্যশোভিত গলায় ভাই বাঙালীকে গণৎকার-বেশে কলেজ স্কয়ার ওয়েলিংটন স্কয়ার প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দেখিতে চাই। দৈনিক অন্তত দুই টাকা আয়ের মূলধনহীন ব্যবসা যদি বাঙালী না পারে, তাহা হইলে সে আর কি পারিবে?

* * *

অন্য কোনো বিজাতীয় পোষাক আমাদের জাতীয় পোষাক হিসাবে গ্রহণ না করিলে আর চলিতেছে না। ধুতির সঙ্গে অনাবৃত ভুঁড়ি, গামছা, চাদর, গেঞ্জি, শার্ট, পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীকোট, শার্টকোট শার্টকোটআলোয়ান! কোট বুকখোলা!—কিছুতেই সামঞ্জস্য হইতেছে না। ইংরেজি কোট এবং শার্টের পরিবর্ত্তে যে আলখাল্লা জাতীয় জামাটি পরিতেছি, তাহার নাম "পাঞ্জাবী"। "বাঙালী" নামে কিছুই নাই। পাঞ্জাবীর আবির্ভাব রহস্যাবৃত। উহা ঠিক

পাঞ্জাবদেশ হইতে আসিয়াছে কি না সন্দেহ। পাঞ্জাবীদের গায়ে কিন্তু এই বাঙালী-পাঞ্জাবী নাই, মান্দ্রাজী বা উৎকলীও নাই, আছে ইংরেজি শার্ট। কিন্তু সে যাহাই হউক আমাদের পাঞ্জাবী যে আমাদের ধুতির সঙ্গে মিশ খাইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালীমাত্রেই যদি পাঞ্জাবী পরিত তাহা হইলে আপত্তির কিছু থাকিত না, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে উহা সকল বাঙালীর মনঃপূত হয় নাই। যাহার যাহা খুশী পরিতেছে। মান্দ্রাজী ভ্রাতাগণও ধুতির সঙ্গে ইংরেজি শার্ট কোট কলার নেকটাই দ্বারা দেহ শোভিত করেন। প্যাণ্ট পরেন না, কেননা জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত! আরো একটু নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে পায়ে জুতা নাই! আমরা অবশ্য এতদূর নামিতে পারি নাই, কিন্তু আমরা যাহা করিয়াছি তাহা খুব প্রশংসাযোগ্য নহে।

* * *

আমরা মূল ঠিক রাখিয়াই কাজ করি। আমাদের গোড়ায় গলদ নাই। কিন্তু এরূপ না করিয়া যদি ধুতির পরিবর্তে প্রথম হইতেই আমরা প্যাণ্ট পরিতাম তাহা হইলে মন্দ হইত কি? প্যাণ্টের উপর পাঞ্জাবী শার্ট কোট সবই মানায়, অন্যদিকে কাপড়ের উপর কিছুই মানায় না! বরঞ্চ কাপড় নিজেই যুগধর্মের একটা প্রতিবাদ। ইহাকে শাসন করিতেই সংযম হারাইয়া যায়, আত্মশাসনের প্রবৃত্তি আর থাকে না। যুবক রবীন্দ্রনাথ যাহা যাহা করিয়াছেন বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাহার সবগুলি হইতেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন, পারেন নাই শুধু তাঁহার চাপকান হইতে। তিনি চাপকানকে সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই চাপকান আজও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চাপিয়া আছে। উকিল-

মোক্তারদের সঙ্গে পোষাকের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যটি কে রাখিলেন ? পোষাকে রাখিলেন অথচ শিরস্ত্রে রাখিলেন না ! শিরস্ত্রের উপর তাঁহার পূর্ব্বে কোন মোহ ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমানে হইয়াছে—উহাতে তাঁহার সযত্ন-প্রসাধনের পরিচয় আছে। ভারতীয় পরিচয় উহাতে নাই, বিশ্ব-টুপিও উহা নহে, উহাতে সেই পূর্ব্বপুরুষের অনুমোদনও নাই যাহা তিনি চাপকানে পাইয়াছেন। অতএব উহা নিরর্থক এবং সেই হেতু অগ্রাহ্য।

* * *

আমাদের মাথা বাঁচাইবার যে কিছুই নাই ইহাতে একদিকে সুবিধাই হইয়াছে। আমরা সবান্ধবে একদিন হয়ত হঠাৎ ধুতির সঙ্গে শোলাটুপি পরিতে পারিব। একটা ছাড়িয়া অন্যটা ধরাতেই আমাদের আপত্তি, কিন্তু শোলাটুপি ধরিতে কিছুই ছাড়িতে হইবে না। আমাদের নিজস্ব শিরস্ত্র একটি আছে বটে কিন্তু তাহার নাম 'টোকা' এবং কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষবিধায়কের সঙ্গে উহার নিকটসম্বন্ধ, সেই হেতু উহা সর্ব্বজাতীয় নহে এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষকের মাথায় উহা এককালে দেখা গেলেও উহার মূল্য নাই।

রাই-কিশোরী

সমর্পণ

রসের সায়রে ডুবিয়া কিবা।
মিলিল রতন বিজুরি-বিভা॥
আঁধারে সে রূপ-মণিকা জ্বলে।
ভানুর কিরণে যাবে কি গ'লে॥
বুকের আঁধারে রাখিনু তারে।
বুকের আঁধার রহিল না রে॥
পুলকে অঙ্গ হইল ভোর।
রতন সে মোর মরণ-চোর॥
কোথা রাখি তারে কোথা লুকাই।
মণি-মঞ্জুষা কোথায় পাই॥
এ বিজুরি-মণি কালোর আলো।
কালোর কোলেই শোভিবে ভাল॥
হৃদয় আমার রভসে দোলে।
সঁপিয়া দিলাম কালার কোলে॥

বয়ঃসন্ধি

তরল লাবণি রসে তনু চঞ্চল গো
চকিত চমকি চলি যায়।
উজান পবনে ক্ষণে উড়ে অঞ্চল গো
লাজ ভরম নাহি পায়॥

পুরুষ হেরিয়া কভু না চায় ফিরিয়া গো
না জানে হানিতে আঁখিবাণ ॥
না জানে পরিতে বাস তনুটি ঘিরিয়া গো
কুন্তল কুটিল নিশান ॥
আধের অধিক বালা চপলা বালিকা গো
তরুণী আধের আধা-আধা।
মুকুল ছিঁড়িয়া কেবা গাঁথিল মালিকা গো
কলিকা বয়সী মোর রাধা ॥
আপন বুকের সীধু আপনি না জানে গো
মুদিত কমল গুণে রূপে।
মোচন মন্ত্র কবে তার কানে কানে গো
ভমরা পাড়িবে চুপে চুপে ॥

যৌবন আওল থোরি।
মুকুল কুচযুগ যতনে ঝাঁপই
অঙ্গ-সচেতনী গোরি ॥
যবহুঁ সখিগণ চোলি বান্ধিতে
বিহসি করু উপদেশ।
হাসি কান্দত কান্দি হাসত
গারি দেই অবশেষ ॥
অলপ যৌবনে রঙ্গ কৌতুক
বচন সহই নহি পার।
রোখে সুবদনী বদন মোরত
শ্রবণে পিবই রসধার ॥

কৈছন রীত পুলকে তনু হরখিত
তবহুঁ রহত মুখ মোরি।
কৌতুক-প্রীত- সরম-ভয়-লালস-
মাল সো নওল কিশোরী॥

*

যবে মুকুর ধরিয়া বালা
বাঁধে চিকুর চিকণ কালা
কেন আপন মুখানি নেহারি নেহারি
হাসে সে অমিয় ঢালা॥
কেন হাসিয়া লুকায় হাসি
চাহে হরিণীনয়নে ত্রাসি
পাছে সখিগণ মেলি করে পরিহাস
লহু লহু সম্ভাষি॥
ধনি যতনে নীবি বান্ধে
চলে ধীর মন্দ ছান্দে
মৃদু মঞ্জীর অতি শঙ্কিত জনু
পড়িবে বিষম ফান্দে॥
গোরি এ তোর হইল কি
যবে পুছয়ে পিয়সখী—
কেন নয়ন উজল জল ছলছল
লাজে নতমুখী॥
হেরি কবি অন্তরে ভাণে
ধনি আপন মন না জানে

বুঝি অবুঝ পাইয়া নিদয় মদন
বিঁধিল পাঁচ বাণে॥

রূপ

জলধি মথিয়া কেবা চান্দ তুলিল রে
জগমোহন নিশিরাজ।
সে চাঁদ নিঙাড়ি কেবা অমিয় গারল রে
ঝরিয়া পড়িল ব্রজমাঝ॥
সে অমিয়-হ্রদে কিবা কমল ফুটিল রে
সে মোর কমলমুখী রাধা।
কি দিব তুলনা তার ভানু বিজলি রে
তাহার তুলনা তিল-আধা॥
চাঁচর চিকণ চুলে কবরী বাঁধিয়া রে
শোভিল মালতী মালে।
সিন্দুর মৃগমদ অলকা তিলকা রে
লাঞ্ছন নিরমল ভালে॥
কাজল উজল কিবা যুগল নয়ন রে
অলপ অলপ ভুরু ভঙ্গী।
বিম্ব অধরে কিবা রঙ্গ হাসিটি রে
হারিল মনমথ রঙ্গী॥
বুকের উপরে মরি পিণ্ড নবনী রে
কুচযুগ কোমলে কঠিন।
নীবিবন্ধন তটে নাভি গভীর রে
ডম্বরু সম কটি ক্ষীণ॥

নিতম্ব লম্বিত জঘন-লগন রে
মেখলা খেলয়ে রঙ্গে।
মন্থর পদযুগ অলস গমনে রে
লাবণি উছলিত অঙ্গে ॥
কি আর বলিব রূপ নয়নে নিরখি রে
হিয়া মোর কাঁপে থরথরি।
রূপেব বালাই লয়ে গলায় বাঁধিয়া রে
রসের কূলেতে ডুবে মরি ॥

*

বিজুরি-বরণ ধনি কে রে।
ব্রজ রমণিগণ সঙ্গে রঙ্গভরে
চললি পানি ভরণে রে ॥
শারদ চান্দ- কিরণ জনু ঝলকই
ক্ষীণ মেহ অপসারি।
রূপক দীপ বসন নহি রোধত
জ্যোতি বিছুরি চলু নারী ॥
হাস ছটাছট ভাষণ লহু লহু
অধরে ক্ষরই গজমোতি।
তরল বিলোচন ভাঙুক ভঙ্গিম
কুটিল ভুজঙ্গিনী হোতি ॥
বাসবচাপ সুরঙ্গিম কাঁচল
কুলিশ পয়োধর জোরা।
নিরখি দুরতহিঁ অন্তর জরজর
দগধল মদন বিভোরা ॥

কে ধনি রসবতী মঞ্জু মঞ্জু গতি
চললি নীর ভরণে রে।
দামিনী বাজ গরল পরসারল
আগি জ্বলল মরমে রে॥

পূর্ব্বরাগ

হাসিয়া হাসিয়া হরষিত হিয়া
গেলি যমুনার তীরে।
সেথায় কি হল তনু টলমল
ঝটিতি আসিলি ফিরে॥
নয়নে তরাস ঘন বহে শ্বাস
থরথরি কাঁপে গা।
সাপের মাথায় অবশে হেলায়
রাই কি রাখিলি পা॥
ও রাজার মেয়ে কার মাথা খেয়ে
যমুনা পুলিনে গেলি।
না ছুঁইলি বারি তবু লো কুঙারী
শ্যামর হইয়া এলি॥
হিয়া বুঝি ফাটে কি দেখিলি ঘাটে
কার ফাঁদে দিলি ধরা।
অবুঝ যুবতী বনের কপোতী
হইলি জীয়নে মরা॥
পিরিতি গরল ওলো সখি বল
হৃদয়ে পশিল নাকি।

এ কাঁচা বয়সে ডুবিলে ও রসে
পরাণ না রহে বাকি ॥

সই কহি তোরে শুন সার।
পিরিতি বেয়াধি জীবনে সমাধি
নিরাময় নাহি তার ॥
যাহারে হেরিলি যে রূপে মজিলি
সে যদি কালীয় কালা।
জলেতে আগুনে অমিয় গরলে
পুড়িয়া বাঁচিবি বালা ॥

*

সই, কেন বা এমন ভেল।
নীপ তরু ছায়ে কে ছিল দাঁড়ায়ে
হৃদয়ে হানল শেল ॥
নয়ানে নয়ানে হসিত বয়ানে
কি কথা কহিল জানি।
হিয়া গরগর কাঁপে থরথর
তনু না আপন মানি ॥
নবীন বয়সে আপনার রসে
আপনি ডুবিয়া ছিনু।
ওকে মনচোরা করিল বিভোরা
আপনা সঁপিয়া দিনু।
প্রথম দরশে অসহ হরষে
অবশ হইয়া গেনু।

মরম কাঁটায় বিঁধিল যে গায়
ছুটিয়া চলিয়া এনু॥
আমারে সেজন করিল এমন
মরি যে মরম ফাটি।
হাসিয়া সজনী কহিছে লো ধনি
সে তোর জীয়ন-কাঠি॥

*

পানি ভরণে ধনি যাই।
আপন নূপুর শবদে চমকি দিঠি
পালটি সচকিত চাই॥
ধীর সমীরণ পরশে নীপসম
পুলক ফুরই বর অঙ্গে।
কুচ কাঞ্চনঘট অঞ্চলে বেপত
ডগমগ মদন তরঙ্গে॥
পথ পাসরি ধনি চলত আন পথে
বিকচ নীপতরু কুঞ্জে।
সখিগণ হসই তবহুঁ চলি যাওত
নূপুর রুনু রুনু গুঞ্জে॥
নাহক দরশ পরশ রস লালসে
অবশ অথির চিত গোরি।
লাজ সরম ভয় ধৈরয গরবহিঁ
মনমথ লেয়ল চোরি॥
গহন কুঞ্জবনে নব অনুরাগিণী
ভেটল লো রসরাজে।

চঞ্চল চরণ চমকি গতি রোধই
রহলি হেঁটমুখী লাজে॥
দরশ লোল দুহুঁ শ্বাস চলত নহি
হেরল দুহুঁ মুখচন্দ।
উপজল হাস কুমুদ জনু বিকশল
প্রেম পহিল অনুবন্ধ॥

অভিসার

শাঙন মাস রজনী আঁধিয়ারা।
বরখত জলধর ঝরঝর ধারা॥
চমকত দামিনী গমকত শেল।
নাগরি চিত কাতর ভৈ গেল॥
শীতল দশদিশ হিয় জলু আগি।
অন্তর গরগর নাগর লাগি॥
শিথিল নীবি শ্লথ পিন্ধন বাস।
ঘন ঘন মোচই তীখণ শাস॥
পহিল প্রেম ধনি রভস ন জান।
তবহুঁ নেহ নহি ধৈরয মান॥
শেজ তেজি অব উঠল অধীরা।
দূর করল কুচ-কাঁচল-চীরা॥
তেজল শিঞ্জিত নূপুর লোলে।
বরতনু ঝাঁপল নীল নিচোলে॥
মন্দির বাহির ভেল কুমারী।
কম্পিত শ্রোণি চলই নহি পারি॥

নিধুবন গেহ তবহুঁ চলি যাত।
কৃতসঙ্কেত রহত যঁহি নাথ॥
একলি কামিনী কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নহি লখই নয়ান॥
দামিনী চমকি দেখাওল পন্থ।
নিকুঞ্জে পাওল পহুঁ রসবন্ত॥

মিলন

নাথ ধরল যব পাণি।
চৌঙকি নাগরি নূন ভেল জনু
লাজলতা অনুমানি॥
করে কর বারিতে শিথিল ভেল তনু
মুকুলিত লোচন জোরা।
কম্পত অধর ভাষ নহি ফুরত
বচন হরল চিত-চোরা॥
চতুর নাহ যব কমল শয়ন পর
ধরি বৈঠাওল পাশে।
রহল হেঁটমুখী ছাতি ফাটি জনু
যাওব দীর্ঘ নিশাসে॥
এ নব নারি করবি যদি ঐছন
কথি আওলি অভিসারে।
রতিরস চাতুরি কছু নহি জানিয়ে
তুহুঁ মুগুধিনি ধনি হা রে॥

কোরে লেই পহুঁ মুখ চুম্বই যব
কহল মধুর মৃদু ভাষা।
নয়নে নীর কথি অঝর ঝরাওলি
ইথে নহি মিটব তিয়াসা॥
হঠতহিঁ নাথ ধরল যব অঞ্চল
কুচ-যুগ মোচন আশে।
দুহুঁ ভুজ জোরি হিয়াপর রাখলি
নহি নহি কহলি তরাসে॥
নীরিবন্ধ যব পরশল নাগর
পুলক ভরল তনু-লীলা।
রভস সরোবরে ডুবল পঙ্কজিনী
তিমির গরাসল দীপা॥

শেষ নিবেদন

এ নব নাগরি শুন মঝু বাত।
তন মন যৌবন লাজভরম ভয়
সোঁপলি কানুক হাত॥
তাকর কোরে গোরি তনু ডারলি
উচিত করলি ইহ কাজ।
সো রসসিন্ধু তুমহু রমণীমণি
ইথে নহি মানিয়ে লাজ॥
দুহুঁ ভুজ ডোরে চতুর-শঠ-নাগর—
কণ্ঠ রহউ নিত ঘেরি।

হেম পয়োধর নিকষ হিয়াপর
পরখ করউ বেরি বেরি।
নাগর মুখপর নয়ন নিঝর তুঝ
ঝরউ অমিত রতি লেহা।
জঘন নিতম্ব সঘন পরিরম্ভণে
জরজর করু পহুঁ দেহা॥
সব তুহুঁ অঙ্গ পহুঁক হিয় রাখিয়ে
পদ কথি রাখবি রাই।
ঐছন ধন্ধ মরম মঝু জাগত
হারি মানি কবি যাই॥
অতয়ে মোহে ধনি দেহ দয়া করি
ও পদ নবনিত-নিন্দু।
বহুত মিনতি করি কহত কৃতাঞ্জলি
অতি লোলুপ শরদিন্দু॥

—চন্দ্রহাস

———

পাদুকা-প্রসঙ্গ

কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে
দহিল হৃদয়-বন সেই ক্ষোভানলে।

কিন্তু লিখিয়াই পরক্ষণে সামান্য জুতার অভাবে দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া কবির মনে যুগপৎ লজ্জা ও আত্মধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে। কবির অবশ্য এইরূপ লজ্জা পাইবার কোনই হেতু ছিল না; কেন না জুতাকে আমরা যত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করি না কেন, প্রকৃত পক্ষে জুতা নিতান্ত সামান্য জিনিষ নহে।

জুতার জন্ম-ইতিহাস অতি বিচিত্র—এবং বিচিত্র বলিয়াই বোধ হয় মহাভারতকারও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতে বিস্মৃত হন নাই। কাহিনীটি নিম্নলিখিত আকারে আমাদের নিকট আসিয়া পহুঁছিয়াছে। একবার জমদগ্নি মুনি মনের আনন্দে তীর লইয়া খেলা করিতেছিলেন; এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রেণুকা তীর কুড়াইয়া আনিয়া দিতেছিলেন। রৌদ্রের তাপ প্রখর থাকায় রেণুকাদেবী পায়ে ফোস্কা পড়িয়া অস্থির হইলেন; ব্যাপারটির দিকে যখন মুনিঠাকুরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল তখন তাঁহার সবটুকু ক্রোধ রৌদ্রের দেবতার উপরেই কেন্দ্রান্বিত হইয়া পড়িল। অতএব, মুনির মান-রক্ষা এবং মুনিপত্নীর চরণ-শ্রী রক্ষা এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া 'জুতা' নামক বস্তুর উদ্ভাবন। কবি রবীন্দ্রনাথ জুতার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষী কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ইহা হইতে কিছু

ভিন্ন। কোনও রাজা ধূলা হইতে পা মুক্ত রাখিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করেন—অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যে বস্তুটির শরণাপন্ন হইতে হয় তাহাই পরে জুতা নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই দুই পৃথক্ বিবরণীর মধ্যে কোনটি যে অধিক প্রামাণ্য তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা তর্ক করুন এবং পুরাবিদেরা গবেষণা করিতে থাকুন; এ সম্বন্ধে কোনও উৎকীর্ণ লিপি বা কীটদষ্ট পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সে তথ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীই ভালো দিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে এইরূপ আবিষ্কার না হওয়া অবধি এ বিষয়ে কোনও চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাহা হউক, আমরা নিরপেক্ষ ভাবে শুধু কাহিনী দুইটি উদ্ধৃত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলাম।

আমার বিবর্ত্তনবাদী কোনো বন্ধু জুতার উৎপত্তির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জুতা গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর পায়ের একটি অক্ষম মানবীয় অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার যুক্তির দৌড় অনেকটা এইরূপঃ জন্তুর খুর এবং অধিকাংশ জুতার রঙ কালো, এবং জুতা ও খুর উভয়ই চলিবার সময়ে খট্ খট্ শব্দ করিয়া চলে। আমার বন্ধু আরও বলেন, মেম সাহেবদের উচুখুরওয়ালা জুতা দেখা অবধি স্বকীয় যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে তাঁহার নাকি আর কোনই সন্দেহ নাই। বন্ধুর অভিমতের বিরুদ্ধে আমি যে সকল সাংঘাতিক প্রমাণ ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন তাহা আর মনে পড়িতেছে না। কিন্তু তাহা যে আমার বন্ধুর থিওরিকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবার যথেষ্ট ইহা নিঃসন্দেহ। যাহা হউক উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা বা

াপব্যাখ্যা জুতার পদমর্য্যাদা খাটো করিয়া দিবার জন্য একটি হীন ড়যন্ত্রমাত্র।

বয়সের দিক দিয়া জুতাকে আভিজাত্য-বঞ্চিত করিবার চেষ্টা থা। জুতা যে কোন স্মরণাতীত কাল হইতে সভ্যতার অপরিহার্য্য ঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ধারণা করা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তির াহিরে। প্রাচীন মিশরের একটি গল্পে জানিতে পাই, মিশরের কানো রাজা নদীতে একজোড়া জুতা ভাসিতে দেখিয়া সেই ুতার অধিকারিণীকে ভালোবাসিয়া ফেলেন। ইহা হইতে বোঝা ায়, তখন জুতার শুধু চলই ছিল না—জুতা গড়িবার পদ্ধতিও তখানি উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে চেহারা দেখিয়াই জুতার ালিক পুরুষ কি নারী এবং সুন্দরী কি অসুন্দরী ধারণা করা াইত। অবশ্য আজকাল এই রীতি অনুযায়ী বর বা বধূ নির্ব্বাচন রিতে গেলে অনেক সময়েই নিরাশ হইতে হইবে। রামায়ণে দখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীমান্ ভরত জ্যেষ্ঠের নামেই রাজত্ব চালাইতেছেন। আরও ত বহু প্রকার বস্তু ছল যাহা দিয়া সহজেই রামের প্রতিনিধির কাজ করানো যাইতে ারিত; কেননা রাম বা সীতা বল্কল পরিলেও নিরাভরণ হইয়া নে আসিয়াছিলেন একথা রামায়ণে লিখে না। কিন্তু শ্রীমান্ ভরত যে সে সমস্তই উপেক্ষা করিয়া জুতাকেই শ্রীরামের যোগ্য প্রতীক বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন, ইহাতে জুতারই কৌলীন্য প্রকাশ পাইতেছে। প্রাচীন লেখকদিগের মধ্যে এক বিষ্ণুশর্ম্মাই জুতাকে অনাবশ্যকভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন,—কুকুরের স্বভাবই নাকি এই, রাজতক্তে বসাইলেও সে জুতা চাটিবেই। কিন্তু যে-জুতা স্বয়ং রাজার প্রতীক হইবার স্পর্দ্ধা রাখে রাজপদলাভ

করিয়া তাহাকে একটু লেহন করা কি এমনই অমার্জ্জনীয় অপরাধ? বিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার রসজ্ঞান একেবারেই কম।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রাচীন বা আধুনিক কোনো সাহিত্যই জুতার যোগ্য সম্মান দিতে পারে নাই। ইংরাজ কবি কাউপার Sofa সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া নাম কিনিয়াছেন; কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে জুতার স্থান যে বহু উচ্চে এ চিন্তা তাঁহার মনেও আসে নাই। আইরিশ লেখক সুইফট তুচ্ছ টাবের কাহিনী লিখিবার হীনতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু জুতা সম্বন্ধে রচনা লিখিলেই যেন তাঁর জাতি নাশ হইত! ক্যারেনের সুন্দরী রাজদুলালী বেরেনিকের একগাছি কেশমাত্র কবি কাটুলসের হৃদয়ে কাব্যধারা উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল কিন্তু রাজকুমারীর চরণের শোভা পাদুকার দিকে কবিপ্রবরের দৃষ্টিও পড়ে নাই। সুরসিক লে হাণ্ট এবং মনস্বী বঙ্কিম জুতার মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া কেন যে লাঠির স্তবগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অন্ততঃ নিজের পদবীটির দিকে চাহিয়াও জুতার কীর্ত্তিকথা স্মরণ করা উচিত ছিল। শব্দতত্ত্বের ক, খ, গ যাঁহার জানা আছে তিনিই স্বীকার করিবেন যে, 'চট্টোপাধ্যায়' 'চট্টলা' 'চট্টগ্রাম' প্রভৃতির নামের মধ্যে চটি নামধারী পাদুকা এখনও তাহার পূর্ব্ব গৌরব লইয়া বাঁচিয়া আছে। কামসূত্র রচয়িতা ঋষি বাৎস্যায়নের মার্জ্জিত রুচি ও রসজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তিনিও তাঁহার প্রসাধনদ্রব্যের তালিকা হইতে জুতাকেই বাদ দিয়া বসিয়াছেন। রূপকথা লেখক Hans Andersenএর জগৎজোড়া

দরদের নাকি তুলনাই হয় না; তাঁহার কাব্যে ষ্ট্রীট-ল্যাম্প, টিনের পুতুল, বুরুষ; মায় দোয়াত কলম পর্য্যন্ত নায়কের সম্মান লাভ করিয়াছে; কিন্তু জুতা সেই হরিজনের মতই অবজ্ঞাত, অবহেলিত হইয়া নেপথ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তথা-কথিত কাব্যের উপেক্ষিতা উর্ম্মিলার কথা ভাবিয়া যে কবি সৌখীন দুঃখে দাড়ি ভাসাইয়াছিলেন এবং নিতান্তই তুচ্ছ একটি পয়সার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কালি, কলম, কাগজ এবং সময়ের অযথা অপব্যয় করিতে যাঁহার দ্বিধা-বোধ হয় নাই, সাহিত্যে নিত্যনিপীড়িত ও অন্যায়রূপে অনাদৃত এই জুতার উদ্দেশ্যে একখানি গান উৎসর্গ করিলে তাঁহার করুণার উৎস কি শুকাইয়া যাইত? 'শনিবারের চিঠি'র সূক্ষ্ম বিচার শক্তি এবং সমদর্শিতা সাহিত্যক্ষেত্রে এখন প্রবাদবাক্যের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। সামান্য 'আরাম কেদারা'ও তাঁহাদের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল! অথচ নিষ্ঠুর সম্পাদক পরম কৌলীন্যগর্ব্বিতা জুতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেও ভুলিয়া গেলেন!

যাহা হউক, সাহিত্যে আদর না পাইলেও জুতার কোন কালেই আদরের অভাব হয় নাই। জুতার অষ্টোত্তরশত নাম নাই বটে, কিন্তু জুতার নামসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। প্রাচীন গ্রীক স্যাণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ডার্ব্বি' ও লপেটা পর্য্যন্ত চেহারার সামান্য ইতর বিশেষে কত যে নাম-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত, পর্য্যায়পরম্পরা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে হিসাব করিতে গেলে একখানি বৃহদায়তন মহাভারত রচিত হইতে পারে। পম্পশু, আলবার্ট, ডার্ব্বি, অক্সফোর্ড, বুট, চাপলি, নাগরাই, লক্কা এই নামগুলি শুধু পরিচিত নহে, প্রিয়। এই নামকরণেও

অনেকে সন্তুষ্ট নহেন—একারণ প্লাকার্ডে রমণীরঞ্জন নাগরা চরণ-শ্রী স্যাণ্ডাল' প্রভৃতি শব্দের আবির্ভাব চোখে পড়িতেছে। জুতার রূপ সজ্জা বিষয়ে কোনও দেশে বা কোনও যুগে ঔদাসীন্য দেখান হয় নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে জুতাকে সোনালী ও রূপালি জরিতে মুড়িয়া দেওয়া হইত। 'লালজুতুয়ার' প্রতি আমাদের ছেলেভুলানো ছড়ার খোকাবাবুদের বিশেষ লোভ দেখা যায়; অবশ্য আজকাল প্রবীণ ব্যক্তিদের পায়েও চকোলেটরঙ্ জুতা স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন রোমে পাদুকার রঙ দেখিয়াই সমাজে পাদুকা-ধারীর পদ নির্দ্দিষ্ট হইত। আজকাল বিলাতী খুরওয়ালা জুতার সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া গেলেও কিছুদিন আগেও স্বদেশীয় সুন্দরীদের মহলে লক্কার খুব প্রতিপত্তি ছিল। আমার কোন পরিচিতা মহিলাকে দেখিয়াছি, মখমলের আস্তরণ দেওয়া নূতন লক্কাজোড়া কিনিয়াই পরম পরিতৃপ্তির সহিত মুখে বুলাইয়া তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেন। জুতার পক্ষে উক্ত প্রকার আদর যে পরমায়ুকালব্যাপী হইত না ইহা নিশ্চিত।

জুতার সহিত জুতার অধিকারীর একটি নিবিড় সখ্যের সম্বন্ধ বিরাজমান একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপরিচিত জুতার ভিতর পা ঢুকিলে কি পরিমাণ অস্বস্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা যাঁহাদের নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার অভ্যাস আছে তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জুতা চুরি যাওয়া একটি অতি সাধারণ ঘটনা এবং জুতার প্রতি মানব-সমাজের প্রেম যে কত নিবিড় ইহা হইতেই তাহার উপলব্ধি হইবে। কোনো ভদ্রলোকের জুতার প্রতি অগাধ মনোযোগ ছিল; চুরি যাইবার ভয়ে একবার তিনি ষ্টীমারের ডেকে জুতা পায়ে রাখিয়াই ঘুম দিতেছিলেন; কিন্তু চতুর চোর

পা হইতেই জুতা খুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। প্রেম ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের এইরূপ যোগাযোগ সচরাচর ঘটে না। কথিত আছে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট একবার কোনো সুন্দরীর জুতা খুলিয়া লইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া পান করিয়াছিলেন; বিলাতের রাজ-নৈতিকেরা সমঝদার পুরুষ ছিলেন।

ব্যবহারিক জীবনে জুতার প্রয়োজন আছে কিনা, ইহা গবেষণা করিবার মত বিষয় নহে। সদ্য পলিশিত নূতন অক্‌স্‌ফোর্ড জোড়া মস্‌মস্‌ করিয়া রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইলে বুক যে দশহাত উঁচু হইয়া উঠে একথা পাঠক অস্বীকার করিতে পারেন কি? সমাজে মানুষের ঠিক স্থান কোথায় তাহা একমাত্র জুতার দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। যাঁহার পায়ে জুতা নাই কোনো সভ্য বৈঠকেই তাঁহাকে ঠাঁই দেওয়া সঙ্গত হইবে না। যাঁহার জুতা তালি-শোভিত তিনি সভার ভিতরে ঢুকিতে পারেন কিন্তু সম্মানিত ভদ্র মহোদয়দের সহিত একাসনে বসিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতারই পরিচায়ক হইবে। কিন্তু নূতন ঝক্‌ঝকে আলবার্টজোড়া পায়ে দিয়া যিনি ঘরে ঢুকিতেছেন তাঁহার যোগ্য আসন কোথায় বুদ্ধিমান পাঠককে এ কথা বলিয়া দিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। গুম্ফহীন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চুরুটহীন প্রমথ চৌধুরী, 'সংস্কৃতি' নামক শব্দ-বর্জ্জিত সুনীতি চাটুর্য্যের প্রবন্ধ, অথবা গুরুসদয় দত্তহীন ব্রতচারী আন্দোলনের পরিকল্পনা হয় ত অসম্ভব নয়, কিন্তু পাঠক কি পাদুকা-শূন্য পদের কল্পনা করিতে পারেন? এই প্রগতি ও পরিশীলনের যুগে কোনো পাদুকা-হীনা তরুণীর পক্ষে কোনো প্রগতিশীল বা প্রকর্ষপ্রাপ্ত তরুণের চিত্তজয়ের আশা করা ধৃষ্টতা মাত্র। গুণ্ঠন-হীন শ্রীমুখের অধিকারিণীর প্রতি আগ্রহবান হওয়া যতখানি বৈদগ্ধ্য-সম্মত গুণ্ঠনহীন

শ্রীচরণের অধিকারিণীর প্রতি আগ্রহবান হওয়া বোধ হয় ততখানি নহে।

পাদুকা-ধ্বনির মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের বা ছন্দশাস্ত্রের নূতন কোনো তথ্য হয় ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহারও মূল্য নিতান্ত কম নয়। পাদুকার শব্দের তারতম্যের সহিত মানব-মনের উত্থান-পতন একটি নিবিড় ঐক্যসূত্রে বাঁধা এবং একই ধ্বনি ধ্বনিকর্ত্তার বিভিন্নতা হেতু মনের মধ্যে বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গ জাগাইয়া তুলে। মনে করুন, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ হয়ত সদ্য প্রকাশিত কোনো অতিআধুনিক উপন্যাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া অধীর মনে মুহুর্মুহু বাহির-পানে ও ঘড়ি-পানে তাকাইতেছেন, ঠিক এমন সময়ে যদি সিঁড়িতে অতি-পরিচিত ও অতি-প্রিয় জুতার ধ্বনিটি বাজিয়া উঠে তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইবে সে কথা বলিতে গিয়া পাঠিকার তীক্ষ্ণ-বিচার-শক্তির অবমাননা করিব না। আজকালকার প্রিয়তমেরা বংশীধরা অপেক্ষা সিগারেট ধরাইতেই বেশি পছন্দ করেন; অতএব বংশীধ্বনির পরিবর্ত্তে পাদুকা-ধ্বনি করিয়াই তাহাদিগকে প্রিয়তমার নিকট আগমনবার্ত্তা জানাইতে হয়। আমরাও বাবা ও দাদা মহাশয়ের পাদুকা-শব্দের অতিক্ষীণ পার্থক্যটুকুও বেশ বুঝিতে পারিতাম, এবং গল্প করিতে করিতে যখন দিক্‌শূন্য হইয়া পড়িতাম তখন এই পাদুকা-ধ্বনিই আমাদিগকে পিতার আসন্ন রোষ হইতে বাঁচাইয়া রাখিত। অপরিচিতের গৃহে অনাহূত ভাবে যাইয়া গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে জুতার শব্দের মত কার্য্যকরী খুব কম বস্তুই আছে; বোধহয় এহিসাবে এক কাশির সহিতই উক্ত বস্তুর তুলনা হইতে পারে।

প্রহার কার্য্যেও পাদুকার প্রয়োজন কম নয়। এবং ব্যক্তিগত ভাবে যষ্টি প্রহার অপেক্ষা পাদুকা-প্রহারকেই আমি বেশি পছন্দ করি। দ্বিতীয়টি অপমানকর; কিন্তু প্রথমটি প্রাণহানিকর। বাঙলার জমিদারদের জুতা না থাকিয়া যদি শুধু লাঠিই থাকিত তাহা হইলে বাঙলার নিরীহ প্রজাদের কি দশা ঘটিত তাহা কল্পনা করিতেও রোমাঞ্চ হইতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় এইরূপ পাদুকা-প্রহারসম্বন্ধে ক্যাথলিক অভিমত পোষণ করিবার নৈতিক বল সকলের নাই। আমার কোনও গুরুজনকে একবার জুতার চিত্র-সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন দেখিতে দিয়াছিলাম, তাহাতে জুতার ছবির ঠিক নীচে আমার নিজস্ব হস্তাক্ষরে 'খাও' এই কথাটি লিখিত ছিল; উক্ত পূজনীয় ব্যক্তিটি ইহাকে অকালপক্কের রসিকতা মনে করিয়া আমার গণ্ডদেশে বিরাশি-সিক্কা পরিমিত একটি চপেটা-ঘাত বসাইয়া দেন। অথচ মোগল আমলে আমাদের দেশেই রাজ পুরুষের পাদুকা-চুম্বন একটি বিশিষ্ট সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইত। ভারতে ইংরেজ অধিকার স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময়ে ক্লাইবের রণনৈপুণ্য ও কূটবুদ্ধিই আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু এই ইতিহাসে জুতার স্থান যে কত বড় ইতিহাস-রসিকেরা সেকথা ভুলিয়া গিয়াছেন। রাল্‌ফ কার্টরিট্ সাহেব নবাব মির্জ্জা মমিনের পাদুকা-চুম্বন করিয়াই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন (Wilson : Early Annals of Bengal) প্রাচীন কাগজপত্র ঘাঁটিলে পাদুকা-চুম্বনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

কিন্তু পাদুকার উপকারিতা এইখানেই সমাপ্ত নয়; বুট নামক পাদুকা যে ক্ষাত্রতেজের উৎস-স্বরূপ, সৈন্য ও অসৈন্যের চলন-ভঙ্গী

দেখিলেই ইহাতে অনুমিত হইবে। Seven league boot অথবা পার্সিউসের স্যাণ্ডাল আজকাল অপ্রাপ্য; কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার 'স্কী' নামক কাষ্ঠ-পাদুকা উহাদের কাহারও অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষী নহে। ইংরেজি ছড়াতে পড়িয়াছি, কে এক বৃদ্ধা নাকি জুতার ভিতরে বাস করিতেন; আধুনিক জুতার ভিতরে বৃদ্ধারা বাস না করুন, আরশুলা বা ইঁদুরে যে বাসা রচনা করিয়া থাকে একথা ঠিক। জুতা মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান বাড়াইতে সাহায্য করিয়াছে এখবর বোধহয় অনেকেই রাখেন না। চট্টগ্রামের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তালতলার খ্যাতি যে চটির জন্য, পাবলিক লাইব্রেরির জন্ম নহে, বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠক সকলেই একথা জানেন। 'বাটা' জুতা না থাকিলে চেকোশ্লোভেকিয়ার নাম কজন বাঙালীর কানে পহুঁছিত? এবং বুটের সহিত সাদৃশ্য না থাকিলে ইটালির মানচিত্র অঙ্কন কি বাঙালীর ছেলের পক্ষে সম্ভব হইত? দূরপথ চলিতে জুতার প্রয়োজন কত, সেকথা না বলিলেও চলে। পরিশ্রান্ত হইলে জুতাকে বালিশে পরিণত করিতে বিশিষ্ট প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। পিপাসার সময়ে হাতের কাছে অন্য কোনো পাত্র কিছু না থাকিলেও চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া জুতাতে করিয়া জল চুমুক দেওয়া দোষের বিষয় হইবে না। আর নিতান্ত আহার্য্যের অভাব ঘটিলে, (পাঠক রাগ করিবেন না) পায়ের জুতা যোড়া গোল্ড-রাশ্-এর নায়কের মত সিদ্ধ করিয়া খাইলে কয়েকদিনের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে।

শেষ শ্রাদ্ধ

১৮

অজিত ও কমল আগ্রা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, দুই এক দিনের মধ্যেই। কোথায় যাইতেছে, তাহাই সকলের সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ অজিত সত্যই তাহা জানিত না। সে মনে করিয়াছিল ষ্টেশনে যাইয়া কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে কোথাকার টিকিট ক্রয় করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে জানিবারই বা তাহার প্রয়োজন কি? তবে কমলকে যে-কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিত তাহাদের গন্তব্য স্থান কলম্বো। সেখানে অজিতের পিতা নারিকেলের ব্যবসায় করিতেন, অত্যন্ত বুদ্ধভক্ত ছিলেন তজ্জন্য কলম্বোতেই কারবার করিতেন। সেখানে তাঁর একটি নারিকেলের গুদাম আছে, উভয়ে আপাততঃ তাহার মধ্যেই আশ্রয় লইবে। তারপর দেখিয়া শুনিয়া ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটিতে যাইয়া তাহারা তুঁতের চাষ আরম্ভ করিবে। ওদিকের আমদানি রপ্তানির বিষয় কমল সবিশেষ জানিত। তাহার বাবা তাহাকে সবই শিখাইয়া গিয়াছিলেন, শুধু সেই বিদ্যা ভাঙাইয়া খাইতে পারিলে শুধু অজিত কেন অনেক লোকেরই পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইতে পারিবে, ইহা কমলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আশুবাবুও স্থির করিয়াছিলেন জীবনের শেষ কয়টা দিন বাসদেও ভৃত্যের একটি বৃদ্ধা পিসিকে লইয়া মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত কোন নিরাপদ স্থানে নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া দিবেন। কামস্কাট্‌কায় এক চীনা চামড়ার

ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, আপাততঃ তাহারই আশ্রয়ে যাইয়া উঠিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের সকলকে বিদায়ভোজ দিবার জন্য হরেন্দ্র একদিন রীতিমত আয়োজন করিল। সেই ভোজে সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী মালিনী, অক্ষয়, অবিনাশ প্রভৃতি সকলেই। অনেক রাত্রি হইল, অথচ কমল আসিল না দেখিয়া সেদিন সন্ধ্যায় কাহারো মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না। যে যাহার জায়গায় বসিয়া সন্ধ্যা হইতে চুপচাপ কড়িকাঠ গুণিতেছিলেন, মশা চাপড়ান ব্যতীত দ্বিতীয় কর্ম্ম ছিল না। কমল যদি আসিয়া পড়ে ইতিমধ্যে এই আশায় মাঝখানে একটি জায়গা ফাঁক রাখিয়া সকলে গোলাকার হইয়া খাইতে বসিলেন। কমল অবশেষে সত্যই আসিল, তাহার হাতে একটি টিফিনকেরিয়ার। নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসিয়া কেরিয়ার হইতে ভাতের পাত্রটি বাহির করিল, একটি কাগজের মোড়ক হইতে শর্করা সংযোগে একটি পেঁয়াজ মাঝে মাঝে কামড়াইয়া খাইতে লাগিল, তরকারিপত্রাদি কিছুই নাই। সে ত আর নিমন্ত্রণবাড়ীর কোন খাদ্যই স্পর্শ করিবে না! ইহা সকলেই জানিতেন, তাই কেহ কোন অনুরোধ, অভিমান ইত্যাদির বাহুল্য প্রকাশ করিলেন না, যে যাহার খাইয়া যাইতে লাগিলেন, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলেন না। তথাপি কতটুকুই বা! কিন্তু মনে হইল যেন কমল রূপে রসে, গন্ধে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সকল জিনিষেই ছড়াইয়া দিল। যেন বর্ষার বন্যলতা! পরের প্রয়োজন মানে নাই, আপন প্রয়োজনেই জীবনধারণের সকল সঞ্চয় লইয়া আপনি মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিল। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয় নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, নিরাশা নাই, এক প্রকার কিছুই নাই! সজিনা ফুলটির মত আপনি ফুটিল, কেহ ফুটাইল

না, কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানর প্রশ্ন কাহারো মনেই জাগিল না! এমনিই হয়!

ডাল ঝোল ইত্যাদির অবিরাম সপাসপ শব্দের একঘেয়েমি ভঙ্গ করিয়া সতীশ কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি ত চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আশ্রমের ছেলেরা সেদিন আপনাকে অত করে ধরলে, তাদের কি ব্যবস্থা করে যাচ্চেন?"

"একলা মেয়েমানুষ, অতগুলি লোকের কি করে ব্যবস্থা করব?"

"নাঃ আপনি আবার উপহাস করচেন!"

হরেন্দ্র স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, 'উনি রহস্য করচেন মাত্র, ওটা ওঁর স্বভাব।"

সতীশ কহিল, "স্বভাব! তা হ'তে পারে, কিন্তু এই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে বাঁচাতে হলে ত একটা বন্দোবস্ত করতে হবে!"

কমল বলিল, "দেখুন, সতীশবাবু, ওইখানেই আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারি না, আমার কথাও আপনারা বোঝেন না, অত্যন্ত একান্ত করে আপনারা প্রশ্নটাকে দেখেন। আমি বলব, নাই বা বাঁচল এ জাতটা, মরেই যদি, এর অতীত গৌরবের পুঞ্জীভূত ব্যাধি নিয়ে মরুক না, জগতের কিছু এসে যাবে না তাতে—"

বাধা দিয়া সতীশ কহিল, "তবে আপনি কি বলতে চান ভারতের ইতিহাস, উপনিষদ, অজন্তা, এলোরা, কালিদাস, তানসেন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের বাণী, এ সবই ধ্বংস হবে?"

"কামনা করি সতীশবাবু, তাই যেন হয়, ওরাই ভারতবাসীকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে এনে হাজির করেচে, মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি কখনো। ওসব ফাঁকা নামের মোহে আপনারা ভুলতে পারেন, আমি ত জানি যে শুধু-কথায় চিঁড়ে ভিজে না। মানুষ নরও নয়, নারীও

নয়, সে হচ্ছে অর্দ্ধনারীশ্বর। তাই মেয়েমানুষকে ত্যাগ করে সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন সব বৃথা, কায়াকে ত্যাগ করে ছায়ার পিছনে দৌড়ান মাত্র!"

ইহার উত্তর কাহারো মুখে জোগাইল না। আশুবাবু অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "দেখ কমল, আমাদের যোগদর্শন বলেচে···"

হরেন্দ্র দৌড়িয়া গিয়া আশুবাবুর মুখে হাতচাপা দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত কমলের কাছে করবেন না, এখনই সর্ব্বনাশ হবে।"

অগত্যা আশুবাবু বলিলেন, "আমাদের 'ইয়ে'তে বলে, নিজের স্বরূপটি জানতে পারাই শক্তি। তুমি বোধ হয় তাই জানতে পেরেচ, তাই তোমার এই তীব্র তিতিক্ষা, তীক্ষ্ণ তর্কাতর্কি···"

কমল বাধা দিয়া বলিল, "ওটা যে আমার ধর্ম্ম কাকাবাবু!"

সতীশ কহিল, "উনি না হয় চেপে গেলেন, কিন্তু আমিই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে, যোগদর্শন সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি কিরূপ, সেটা না জানতে পারলে ত আর আশ্রমের ছেলেদের একটা কিনারা হতে পারচে না···"

"না, ওতে তাদের কোন কিনারাই হবে না সতীশবাবু। ওর মধ্যে শ্লীলতার লেশমাত্র নেই। যদিও যোগদর্শন কি বস্তু আমি কিছুমাত্র বুঝি না, তথাপি অভিজ্ঞতাদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝেচি যে যোগটা হচ্ছে এক-এর বাঁ-দিকে হর্দ্দম শূন্য লাগিয়ে যাওয়া। একশো বছর চক্ষু বুজে তপস্যা করলেও একমুখ দাড়ি আর নখ চুলই গজাবে, কিন্তু একের পিঠে শূন্য আর বসবে না, চোখ চাইলেই যে ফাঁকাকে সেই ফাঁকা। কিন্তু রাত্রি অনেক হ'ল বোধ করি কাকাবাবু, এইবার আমি উঠি।" বলিয়া সে ভুক্তাবশেষ কেরিয়ারের পাত্রে নিক্ষেপ

করিয়া সত্যই উঠিয়া যায় দেখিয়া অক্ষয় দ্রুত উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "দেখুন, এতদিনে বুঝেচি, আপনি যা বলেন, তাই ঠিক্। আমার পরিবারটি এতদিন পেটের অসুখে ভুগে ভুগে এমনটি হয়েছে, যেন একটি পেত্নী, দেখলেই গা-টা ছম্ ছম্ করে। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে নাকি প্রত্যাদেশ পেয়েচে আমার পা ধোয়া জল খেলেই তার ব্যায়রাম সারবে। সর্ব্বদা একটি ঘটি জল হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্চে, দেখ্‌তে পেলেই পা ধুয়ে জল খাবে, আমার পায়ে ত হাজা ধরিয়ে দিয়েচে," এই বলিয়া কমলকে পা তুলিয়া দেখাইল সত্যই তাহার পা-টা হাজায় ভরিয়া গিয়াছে। কমল কিছুই বলিল না, বলিবার কিইবা ছিল? অক্ষয় কাতর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিল, বল, তুমি এর একটা ব্যবস্থা করবে? যদি মত কর ত কোথাও তোমাকে যেতে হবে না, এখানেই বেশ একটা বড় বাড়ী ভাড়া করে—" অজিত কখন আসিয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই, অথচ সে কমলের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অক্ষয়কে বাধা দিয়া সে কহিল, বাঃ, তা কি হয়! আজ রাত্রেই আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে, আর অক্ষয় দা বল্‌চ কিনা বাড়ীভাড়া করবে, না, না, তা কেমন করে হবে।"

কমল অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িল। যেন তাহার জীবনের এই মুহূর্ত্তটিতে দু'টি সূর্য্যই যুগপৎ উঠিতে চায়। এরূপ হইবে, সেত পূর্ব্বে ভাবে নাই! এখন কি করিবে সে? সে জানিত শিবনাথ গুণী, শিল্পী, অজিত একজন বিচক্ষণ মোটর মেকানিক, অক্ষয় একজন সুপণ্ডিত ইতিহাসের অধ্যাপক। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী প্রেম ওদের 'পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন;

মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য, নচেৎ ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। সূর্য্যাস্তবেলার মেঘের গায়ে যে রং ফোটে, তার বর্ণও আপন নয়, সে স্থায়ীও নয়, দেখিতে দেখিতে তার কতরূপই না পরিবর্ত্তন হয়, কখনও ঘোড়া, কখনও উট, কখনও অষ্ট্রিচ, কখনও হিপো-পটেমাস, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিবে কে? কে বলিবে তাহারা এক একটি নিষ্ঠুর সত্যের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিতেছে না? কি করিয়া তাহার জীবনে এই চমকপ্রদ এবং মর্ম্মান্তিক সমস্যার সমাধান হইবে?

সে ভাবিয়া একটি উপায় স্থির করিল। বলিল, "দেখুন এই আধুলিটা আমি আকাশের দিকে ফিঁকে দেব, যদি রাজার মুখ চিৎ হয়ে পড়ে তবে অক্ষয় বাবু যা বল্‌বেন তাই ঠিক্, আর যদি উল্টো দিক চিৎ হয় তবে অজিতবাবুর প্রোগ্রামই ঠিক্।" বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর উপায় ছিল কি? কিন্তু আধুলিটা পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিল, কোনদিকেই আর টলে না। অক্ষয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আধুলিটি ধরিয়া চিৎ করিয়া দিলেন। আশুবাবু কহিলেন, "ও হ'ল না, আমায় দাও আবার কর্‌চি।" এমন সময় এক টেলিগ্রাম পিওন দ্বার প্রান্তে উপনীত হইতে তাঁহার হাতের মুদ্রা হাতেই রহিল। হরেন্দ্র তারটি খুলিয়া পড়িলেন:—তিন চার দিন হইল রাজেন্দ্র মারা গিয়াছে। সে কয়দিন যাবৎ মথুরার পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান তাহার ছিল না। হঠাৎ স্থানীয় হনুমান্ জীউর মন্দিরে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় রাজেন্দ্র আগুনে ঝাঁপ দিয়া জ্বলন্ত হনুমানজীর মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করে, কিন্তু তাহাতেও মূর্ত্তিস্থ অগ্নি প্রশমিত না হওয়ায় সে তৎসহিত নিকটস্থ কূপে

ম্প প্রদান করে। তাহার পর ডুবুরিদের সাহায্যে উভয়কে কূপ
ইতে উত্তোলন করিলে দেখা যায় রাজেন্দ্র এবং হনুমানজী পরস্পর
ালিঙ্গনবদ্ধ এবং উভয়ই অর্দ্ধ দগ্ধীভূত। বস্তুতঃ কোনটি রাজেন্দ্র
ার কোনটি হনুমানজী তাহা বুঝিতে না পারিয়া উভয়কেই
হাসমারোহে একত্রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। একটি বেশ বড়
ঠ উক্ত সমাধির উপর প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সে জন্য মথুরায়
দা উঠিতেছে, মঠ-কমিটীর সেক্রেটরি সংবাদটি জ্ঞাপনপূর্ব্বক
জেন্দ্রের বন্ধুবর্গের নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন। প্রিপেড তার,
দার টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইলেই ভাল হয়। আশুবাবু কাঁদিতে
াদিতে হস্তস্থিত আধুলিটি এবং আর একটি পাঁচ টাকার নোট
ই মোট সাড়ে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিলেন। অজিতও
কেট হইতে কিছু বাহির করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু কমল তাহার
ত চাপিয়া ধরিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "না, তুমি এক পয়সা
য়ো না। অজ্ঞানের বলি চিরদিন এম্‌নি করেই আদায় হয়,
লেছিলাম না সমাধিস্তম্ভের নাম দিয়ে কেবল ভূতেরই পূজা করা
বে। অমন নিশ্ছিদ্র করে বাড়ী গাঁথতে যেয়োনা, ওতে মড়ার
বর তৈরী হয়, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হয় না, রামদীন
লা।" এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিল। অজিত সত্যই
লয়া যায় দেখিয়া অক্ষয় মিনতির স্বরে বলিল, "দেখ অজিত
াদিন তাজমহলের সমুখে যে পিঠে ঘুসি মেরেছিলে, শিরদাঁড়াটার
থা কিছুতেই যাচ্ছে না, একজন গুণীন্‌ বলেচে—যে মেরেছে
ার বাঁহাতটা পিঠে বুলিয়ে একটি মন্ত্র আবৃত্তি কর্‌লেই এটা
ারে যাবে। আমি মন্ত্রটা মনে মনে বল্‌চি, তুমি ভাই আমার
ারদাঁড়ায় তোমার বাঁহাতটা বুলিয়ে দাও।"

বারান্দা হইতে নীচেই দেখা গেল কমলকে লইয়া আশুবাবু গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মোটরের আলো দূর হইতে দূরান্তরে মিলাইয়া গেলেও অজিত অক্ষয়ের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি যেন বহুমূল্য জিনিষ হারাইয়াছে এরূপ ভাবে ব্যস্ত হইয়া এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিল।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, ' কি, কি, কি হারাল ?"

অবশেষে অজিত জামার ভিতর-পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া বাহির করিল, লণ্ঠনের আলোকে তাহা পড়িবামাত্র আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "অক্ষয়দা, আমার মালপত্রের লিষ্ট, ভয় নেই, একটা ডুপ্লিকেট কমল রেখে গেছে, বাসায় যেয়ে সব মিলিয়ে নিতে হবে মালটাল সব ঠিক আছে কিনা, একটা বিছানার মোটের মধ্যে একগাদা টাকা আছে যে !"

বাহিরের অন্ধকারে মুখ বাড়াইয়া অক্ষয় বলিল, "তা ত হ'ল, ওরা গেল কোথায়, কামস্কাট্‌কায় না কি ?"

প্রত্যুত্তরে অজিত অক্ষয়ের পৃষ্ঠে বাঁ হাত বুলাইতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

—শ্রীপূর্ণগ্রাস

শেষ

কলেজ-গার্ল

১

রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামে দিয়ে
ওই ঘড়ীর কাঁটার সো'য়া পাঁচটা হলে
এই রাস্তা বেয়ে ধীরে যায় সে চলে ;
তুমি চিনবে ওকে
তার করুণ চোখে
খুব ক্লান্ত বিষণ্ণতা ফুটবে তাতে
খান তিনেক পুঁথিও আর থাকবে হাতে ;
যাবে আপন মনেই তার মেয়েলী বাঁটের
ছাতা বাঁহাতে নিয়ে।
রোজ বিকেল বেলা এই জান্‌লা খানির
ঠিক সামে দিয়ে।

২

মানে কলেজ ফেরত যায় একটি তরুণী
তার বাসার পানে,
তার বয়েস, যেমন হয় উনিশ-কুড়ি,
তবু ওদের মতন হয়ে যায়নি বুড়ী
তাকে দেখলে পরে
মনে খটকা ধরে

অত অল্প বয়সে মেয়ে পড়ছে বি-এ ?
কেন তোমাকে ঠকাব বাজে মিথ্যা দিয়ে !—
সে যে আই-এতে প্রথম হল সে কথা জাননা ?—
সে ত সবাই জানে ;
রোজ কলেজ ফেরৎ যায় সেই যে মেয়েটি
তার বাসার পানে।

৩

তার গায়ের রঙের মত অমন দেখোনি
আর, বলতে পারি।
ঠিক মেঘের পরেই যদি রৌদ্র উঠে
তবে নতুন পাতার রঙ্ যেমন ফুটে
ঠিক তাহার মত
সেযে সুশ্রী কত
ব'লে বুঝানো যায় না কভু সে সব কথা,
দেখে সবারই বুকে আসে চঞ্চলতা ;
তার সুডোল মুখটি আর পাতলা গড়ন
বড় চমৎকারই !
তার গায়ের রঙের মত অমন দেখোনি
আর, বলতে পারি।

৪

তার দুইটি চোগের মাঝে তারাভরা আকা
শের রয়েছে ভাষা,

মানে আকাশ হতেও চোখ অতল আরো,
তার চাউনি দেখেই প্রেমে পড়তে পারো ;
যদি মনের ভুলে
চায় নয়ন তুলে
তবে তোমার দফাটি সারা বুঝতে হবে,
মানে পাগল হতেও আর বাকি না রবে
যত অন্যমনাই হও, বিরহী প্রেমিক
বুকে বাঁধবে বাসা।
তার দুইটি চোখের মাঝে ভাবাভবা আকা-
শের রয়েছে ভাষা।

৫

ঠিক দু'দিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চ'লে ,
আর তাহারো দু'দিন পরে ধরবে পিছু,
ওহে বাড়িয়ে বলিনি আমি তেমন কিছু,
—ছেলে তোমার মত
দেখে এলাম কতো !
শেষে নাম ও ঠিকানা সব যোগাড় হলে
প্রেম- পত্র গোপনে কত লেখাও চলে,
এর একটি কথাও আমি বানিয়ে বলিনি,
বলো লাভ কি বলে।
ঠিক দুদিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চলে।

লাগিল। একবার হোঁচট খাইয়া যেমন লাফাইয়া উঠিয়াছি, দেখি তিন তালা সমান উঁচুতে উঠিয়াছি! পড়িবার ভয়ে চক্ষু বুজিয়া রহিলাম—ভাবিলাম এ কি ভৌতিক ব্যাপার! মাটিতে পড়িবার পর যেমন সেই স্থান হইতে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছি, দেখি এক পদবিক্ষেপে সাড়ে বাইশ হাত করিয়া লাফাইয়া চলিয়াছি"। কোথায় লাগে long jumpএর লম্বা লাফ। অভ্যাস বশতঃ ইষ্টনাম জপিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ভগবান বলিতেছেন—তোমার বুঝি চন্দ্রলোকে সুবিধা হইল না? আচ্ছা সূর্য্যলোকে যাও। সূর্য্যলোকের কথা শুনিয়া মনে মনে বড় আনন্দ হইল (তখনও সেই হাড়জমান শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি কি না!)। কিন্তু আনন্দ হওয়াই সার—আনন্দ মন হইতে বাহিরে প্রকাশ হইতে পারিল না। কিছু বলিবার বা ভাবিবার পূর্ব্বেই দেখি আমাকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তিতে চন্দ্রলোক হইতে সূর্য্যলোকে লইয়া যাইতেছে। সূর্য্যলোক হইতে যখন এক কোটি যোজন দূরে আছি, তখন হইতেই যেন গা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। কোথায় লাগে পশ্চিমের বৈশাখী লু। ভীষণ আলো; চারিদিকেই যেন জ্বলন্ত লোহা সাজাইয়া রাখিয়াছে, চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে, সূর্য্যের দিকে চাহিবার উপায় নাই। সাহস করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য হাত আড়াল করিয়া চক্ষু মিটি মিটি করিয়া চাহিয়া দেখি সূর্য্যদেব লোহা গলাইয়া ধোঁয়া করিয়া উপর দিকে ফুঁ দিতেছেন; সোনা গলিয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। আর ফুঁয়ের কি জোর, কোথায় লাগে এরোপ্লেনে ঘণ্টায় ২০০ মাইল! একেবারে ঘণ্টায় ১০০,০০০ মাইল বেগে ঝড় বহিতেছে। ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল;—কোন কথা মুখ দিয়া বাহির

হইবার পূর্ব্বেই কাঁদিয়া ফেলিলাম। এ সুর করিয়া কান্না নহে, বা পুরুষ মানুষ বলিয়া চোখে রুমাল দিয়া শোক সভার কান্না নহে, একেবারে ভেউ ভেউ করিয়া ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদা! এত কথা বলিতে যে সময় লাগে ইহার মধ্যেই আমি সূর্য্যের উত্তাপে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইল— ভগবান কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা আমার মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল, তখন শুনিলাম "শরীর সুস্থ হইলে ব্রহ্মলোকে যাও।" দুই দুইবার বিপদে পড়িয়া এবার ব্রহ্মলোকের কথা শুনিয়া আনন্দও হইল না দুঃখও হইল না। ভাবিলাম ব্রহ্মলোকে গিয়াই দেখিনা সেখানকার হাল চাল কি রকম। শরীর সুস্থ হইতেই ব্রহ্মলোকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মধ্যে ১০৮-পাপড়িওয়ালা লাল পদ্মের উপর বসিয়া আছেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। পদ্মটি কিরূপ বড় তাহা তোমরা ধারণা করিতে পারিবে না। ইডেন গার্ডেনে যে বৎসর ছোট ওয়েম্বলী একজিবিশান হইয়াছিল, সেই বৎসর সাড়ে তিন হাত ব্যাসের Victoria Regia আনা হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল ঐরূপ ফুলই বুঝি খুব বড় ফুল। কিন্তু ব্রহ্মার লাল পদ্মের এক একটি পাপড়িই অত বড়। ব্রহ্মা লাল কাপড় পরিয়া চারি মুখে চতুর্বেদ নিয়তই পাঠ করিতেছেন আর তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ষাট হাজার দেবর্ষি, তিন শত ষাট হাজার রাজর্ষি ও বারো লক্ষ মহর্ষি কেহ বা স্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ বা সাম গান করিতেছেন, আর কেহ বা তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। এক এক জনের দাড়ি কি বড় ও কি লাল। কোনো দাড়ির ঝুলই কোমরের কম নহে; কাহারো কাহারো আবার হাঁটু পর্য্যন্ত, দু চারি জনের "আ-পা"-দাড়ি অর্থাৎ পায়ের

ঝোকাবি অবধি আসিয়াছে। যজ্ঞের ধোঁয়ায় কাহারো কাহারো দাড়ি কটা লাল, কাহারো দাড়ি এত লাল যে দূর হইতে হঠাৎ কাল দেখায়। আমি সংস্কৃত জানি না বেদপাঠের বা বেদ শ্রবণ করিয়া বুঝিবার অধিকার নাই—দূর হইতে শুনিতে লাগিলাম কি একটা হইতেছে। সে যা ভীষণ গণ্ডগোল—মোহনবাগানের খেলায় গোল হইলেও গোল গোল করিয়া অত গণ্ডগোল হয় না। কাহারো কথা শুনা যাইতেছে না; কেহ কাহারো কথা শুনিতেছে না—সকলেই আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। খানিকক্ষণ বেদপাঠ + সামগান + স্তবপাঠ + অপর কিছু—একত্রে সকলের mixture খানিকক্ষণ শুনিবার পর ঘুম আসিতে লাগিল, ঢুলিতে লাগিলাম—কিন্তু সেই ভীষণ গণ্ডগোলে ঘুমাইতে পারিলাম না। ক্রমাগত ঘুম না হওয়ায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল—মারা যাইবার উপক্রম হইলাম। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে ব্রহ্মাব এক দিন আমাদের মানুষের যাট হাজার বৎসরের সমান। আর ব্রহ্মা ভোর হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অর্থাৎ আমাদের পনের হাজার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বেদ পাঠ করেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম একি গ্রহ—এযে একেবারে সতীশ ঘোষালের পাঠশালা। সতীশ ঘোষাল ফোকলা দাঁতে দাতাকর্ণ পড়িয়া যাইতেছেন; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে পড়ুয়ারা চীৎকার করিয়া মাথামুণ্ডু যাহা তাহা সুর করিয়া বলিয়া যাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে ব্রহ্মার দিকে পিছন করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছি জানি না, অনেকক্ষণ ছুটিবার পর এক যায়গায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে ভগবানের আদেশ হইল

আমাকে ধরিয়া বিষ্ণুলোকে লইয়া যাওয়া হউক। আদেশ হইবা-মাত্র চারিজন বিষ্ণুদূত আসিয়া আমার চারি হাত পা ধরিয়া শূণ্যে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিলাম আমার কত নীচে নক্ষত্ররা রহিয়াছে। বিষ্ণুলোকে যাইবার পথের আকাশ একেবারে অন্ধকার—কোন গ্রহ, নক্ষত্র নাই। এইরূপে কতকক্ষণ চলিয়াছি বলিতে পারি না—তবে মধ্যে একঘুম দিয়া লইয়াছি, এইজন্য মনে হইল সারা রাত্রি চলিয়াছি, চলিতে চলিতে একজন বিষ্ণুদূত বলিলেন যে এক্ষণে ভগবান বিষ্ণু দিবা-নিদ্রা যাইতেছেন, তুমি বিষ্ণু-লোকের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাক ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উঠিয়া তোমার বসবাসের সুব্যবস্থা করিবেন! ইহার অল্পক্ষণ পরে আমাকে এক কোণে দাঁড় করাইয়া দিল। দেখি ভগবান বিষ্ণু সহস্র সহস্র ফণাযুক্ত নাগ-রাজ বাসুকীর উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, মা লক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন; আর অনেক দূরে গড়ুর পক্ষী করযোড় করিয়া (আমাদের পূর্ব্বোক্ত সতীশ ঘোষালের পাঠশালায় নীল্-ডাউন (kneel-down) করা দুষ্ট ছেলের ন্যায়) বসিয়া আছে—কি মিনতি ও হীনতার ভাব তাহার পক্ষী-চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিয়াছে! বিষ্ণুর মাথার দিকে নারদ মুনি ক্রমাগত একতারা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতেছেন —দেবর্ষি নারদের কি ধবধবে সাদা দাড়ি, আর কি পরিষ্কার—প্রত্যেক দাড়িটি সজিনার আটা দিয়া মাজা চক্‌চকে যজ্ঞোপবীতের ন্যায়, আর দাড়িতে দাড়িতে কি সুন্দর inter-coiling—অর্থাৎ পাক খাওয়া জড়ান জড়ান গাঁইট। কোথায় লাগে ঢাকাই অমৃতি! দাড়ির পাক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম কেন লোকে দেবর্ষি নারদকে ঝগড়ার মূল বলে। দাড়ির প্রত্যেক পাকে দুষ্ট

বুদ্ধি ও বজ্জাতি—টানিয়া ছাড়ান দায়। একতারায় নানান স্বরে একই শব্দ হইতেছে—ট্যাঁও! ট্যাঁও! ট্যাঁও! ট্যাঁও!! ট্যাঁও ট্যাঁও!! ট্যাঁও!!! ট্যাঁও!!! ট্যাঁও!!!............শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। নাগরাজ বাসুকী তাঁহার সহস্র সহস্র ফণার মধ্যে মাঝে মাঝে একটি এই অভাগার দিকে ফিরাইয়া লক্‌লকে সরু জিহ্বা বাহির করেন—আর আমার বুক ভয়ে দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। এইরূপ চলিতেছে, এমন সময়ে ভগবান বিষ্ণু পাশ ফিরিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাসুকী তাঁহার বড় ফণার দুইটি হাঁ করিলেন। সেই হাঁ দেখিয়া—সেই হাঁর সহিত তুলনা করিবার একমাত্র উপমা যাহা আমায় মনে আসিতেছে মুঙ্গেরের নিকট একটি রেলের টানেল, একেবারে বাহাত্তর খানা মালগাড়ী আর এঞ্জিন গ্রাস করিয়া ফেলে—সেই হাঁ দেখিয়া—ভয়ে আমি বিষ্ণুলোক অপবিত্র করিয়া ফেলিলাম। তাড়াতাড়ি সামলাইতে যাইতেছি এমন সময়ে দুইজন বিষ্ণুদূত আমায় দুই কান ধরিয়া বিষ্ণুলোক হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বিষ্ণুলোকের সীমানায় আসিয়া এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে একেবারে গড়াইতে গড়াইতে বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাস ধামে। কৈলাস শিবের পুরী—সেখানে জগজ্জননী মাতা অন্নপূর্ণারূপে দীন দুঃখী ভিখারী সকলকে পরম পরিতোষ সহকারে পায়সান্ন দিতেছেন—যত ইচ্ছা খাও, কেহ কোন রূপ আপত্তি করিবে না। বিষ্ণুদূতের ধাক্কা খাইয়া গায়ে বিষম ব্যথা হইয়াছিল। ভৃঙ্গি আমার গায়ের ব্যথার কথা জানিতে পারিল—কি করিয়া জানিল তাহা জানি না, তবে জানিতে যে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, আমাকে দেখিয়া বলিল ওহে! আমার এই

লিকায় ত্বরিতানন্দের অবশেষ আছে, আগুন নিবিবার উপক্রম রিতেছে তবে তোমাদের মর্ত্ত্যের লোকের দুই চারি টান চলিবে। নে দেখ গায়ের ব্যথা মরিয়া যাইবে। এই বলিয়া তাহার নিবস্ত রিতানন্দের কলিকাটা আগাইয়া দিল। সে শিবলোকের ত্বরিতানন্দ ামার মতন পাপীলোকের সাধ্য কি যে তাহাতে টান ধরাই, চেষ্টা রিতেছি পারিতেছি না তাহা দেখিয়া ভৃঙ্গি বলিয়া উঠিল "থাক, ক! সন্ধ্যা আগত প্রায়—আবার বৈকালিক সিদ্ধি ঘোটন আরম্ভ রই হইবে—তুমি ভিতরে যাও—প্রসাদ পাইবে।" এই বলিয়া ভৃঙ্গি জাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দিল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। খি দলে দলে ভূত প্রেত দানা দৈত্য পিশাচ যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ ড় বড সিদ্ধির গোলা লইয়া খেলা করিতেছে। কেহ বা তাহা পরে ছুঁড়িয়া দিয়া লুফিয়া লইতেছে, কেহ বা হাল ফ্যাশানে টবল গড়াইতেছে; কেহ বা মানস-সরোবরের জলে তাহা গুলিবার ষ্টা করিতেছে। গোলাগুলি বড় বড়—সে রকম গোলা মর্ত্ত্যে খিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। এক একটি গোলা মানুষ সমান ়। এইরূপ একটি গোলা গড়াইয়া আমার গায়ে পড়িল, পড়িয়া লাম কিন্তু কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না—শিবলোকের গোলা না, উঠিয়া যে গোলা ছুঁড়িয়াছিল তাহাকে বলিলাম 'তুমি কি নুষ দেখিতে পাও না, যে আমার দিকে গোলা ছুঁড়িয়াছিলে?' গোলা ছুঁড়িয়াছিল সে একটা "স্কন্ধ কাটা" ভূত। আমার কথা নিয়া হা! হা! করিয়া শব্দ করিল। বলিল আমরা দেখিতে ই না, তবে মানুষ ধরিয়া ধরিয়া খাই। যখন মানুষ ছিলাম তখন কখানা মাসিক পত্রে লিখিতাম কিন্তু সমালোচনার আঘাতে মারা ায়া ভূত হইয়াছি। এখন মানুষের উপর প্রতিহিংসা। তুমি কি

মানুষ ?” এই বলিয়া প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিবার জন্ত হাতড়াইতে লাগিল। ব্যাপার বড় গুরুতর দেখিয়া আমি যেমন লুকাইতে যাইব—অমনি আর একটা ভূতের পেটে ঢুঁ লাগিল—সে ফস করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, ফেল তিন টাকা ছয় আনা!

আমি বলিলাম কেন ? ভূত বলিল—চাঁদা আদায় করিয়া লোক ঠকাইয়া খাইয়াছ—কাগজ বাহির কর নাই—ফেল টাকা!

ভূতকে তিন টাকা ছয় আনা বাহির করিয়া দিয়া বাঁচিলাম। পৃথিবীতে কে উক্তরূপ কাণ্ড করিয়াছে আর তাহার ফলভোগ করিতে হইল আমাকে! এক মানুষের পাপ, সকল মানুষের পাপ!

যাহাহউক এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পবনদেব হরিণে চড়িয়া দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে দেবকার্য্যের পরামর্শ সারিয়া বাড়ী অর্থাৎ ইন্দ্রলোকে ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকে কাকুতি মিনতি করিতে তিনি আমাকে হরিণের পৃষ্ঠে বসাইয়া অর্থাৎ হরিণের লেজে গেরো দিয়া আমাকে বাঁধিয়া স্বর্গের ইন্দ্রলোকে লইয়া গেলেন। ইন্দ্রের তখন সান্ধ্য মজলিস চলিতেছিল। মধ্যে সিংহাসনে সহস্রচক্ষু দেবরাজ ইন্দ্র বাম দিকে শচীর কাঁধে হাত দিয়া বসিয়াছেন; ডান হাতে কি একটা বোতামের মতন ধরিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে সারি সারি দেবতাগণ। বরুণের চক্ষু অরুণ বর্ণ—চক্ষু বুজিয়া আছেন; মাঝে মাঝে চাহিতেছেন। সূর্য্যদেব স্বীয় সহধর্ম্মিনী ছায়াকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। ছায়া সম্মুখে চেয়ারে বসিয়াছেন—আর তাহার পিছনে সূর্য্যদেব দাঁড়াইয়া আছেন। চন্দ্রদেব তাঁহার সাতাশটি স্ত্রীকে চক্রাকারে লইয়া কিছু দূরে তাকিয়া ঠেস দিয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ কেহ একলা কেহ স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া

বসিয়াছেন। ঋষি টুম্বুরু তানপুরার ন্যায় একটা যন্ত্র লইয়া গান গাহিতেছেন; উর্ব্বশী নাচিতেছেন। উর্ব্বশীর সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠিক রাখিবার জন্য মেনকা আর রম্ভা হাততালি দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মেনকা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আসেন নাই? আমরা তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটা নাচ শিখিয়া লইব যে! আমি আশ্বাস দিয়া কহিলাম, আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। মেনকা খুশী হইয়া যথাস্থানে গিয়া তাল ঠুকিতে লাগিল। ঘৃতাচী প্রভৃতি অন্যান্য অপ্সরাগণ কেহ কেহ নাচিবার উদ্যোগ করিতেছেন; আবার কেহ কেহ নাচা শেষ করিয়া পাখার বাতাস খাইতেছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সকলকে স্বর্গের সুধা বিতরণ করিতেছেন। বরুণের আবশ্যক হইলে চক্ষু মিটি মিটি করিয়া চাহিতেছেন আর হাত বাড়াইয়া দিতেছেন। ইন্দ্রের ঠিক সামনে গন্ধর্ব্বদের রাজা চিত্রসেন বসিয়াছিলেন—তিনি উর্ব্বশীর নৃত্যকলায় মোহিত হইয়া নিজেও নাচিতে সুরু করিলেন। তাঁহার নাচ দেখিয়া সকলে বাহবা দিতে লাগিল। এই সময়ে এক তুমুল কাণ্ড হইল—চিত্রসেন নাচিতে নাচিতে উর্ব্বশীর নিকট যাইয়া যেমন তাঁহাকে ধরিতে যাইবেন উর্ব্বশী অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দেবরাজের দক্ষিণ হস্তে সেই বোতামের মতন জিনিসটাকে ঘুরাইয়া দিলেন—আর সে কি ভীষণ শব্দ কড়্! কড়্! কড়্! কড়াক্কড়্! কড়াক্কড়্! করিয়া দেবসভায় শত শত বজ্রপতনের শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রসেনের গায়ে আগুন লাগিয়া গেল—নিমেষের মধ্যে তিনি পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পুড়িল না তাঁহার সোনার টুপি আর বার্ণিশ স্লিপার। দেবসভায় যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি নাচিতেছিলেন কেবল সেই স্থানে বড় একটা গর্ত্ত দেখা যাইতে লাগিল। ইন্দ্র রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন—

তাঁহার সহস্র চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বার বার চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। আমার সহিত বার বার ১০০২ চক্ষু মিলিত হইল। আমার বুক ঢিব ঢিব করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে গুটি মারিয়া পিছাইতে লাগিলাম। এমন সময়ে বরুণ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—গানবাজনা বন্ধ কেন? ঘৃতাচী তুমি নৃত্য আরম্ভ কর। ঘৃতাচী বলিল আমি এই মাত্র নৃত্য শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি। দেবরাজ তখন বলিলেন তাহা হইবে না, সকল অপ্সরীদেরই একত্রে নৃত্য করিতে হইবে। দেবরাজের আদেশ শুনিয়া মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি সকলেই হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন, চন্দ্রের স্ত্রীগণও নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; ছায়াদেবী চন্দ্রের হাত ধরিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্যের কসরৎ দেখাইতে লাগিলেন; অন্যান্য দেবদেবিগণ নৃত্যের আসরে আসর জমাইতে আরম্ভ করিলেন—আমি তৎকালে ইন্দ্রলোকের দরজায়! বেশি আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আসিবার সময় উর্ব্বশী গোপনে আমার কাছে একখানা চিঠি দিয়া কহিলেন যথাস্থানে দিবেন। ঠিকানাটা পড়িয়া দেখিলাম—নারীরক্ষা সমিতির সম্পাদককে লেখা। আমি খুব উৎসাহিত হইয়া কহিলাম নিশ্চয়ই দিব—আপনাদের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। * * *

এখন মধ্যাহ্ন ভোজনের 'পর স্বর্গের কথাটা প্রায়ই ভাবিয়া থাকি। এই ত হিন্দুর স্বর্গ, একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন প্রাণান্তকর!—ইহারই জন্য পৃথিবীতে বহু লোভনীয় দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয় এবং বহু তপস্যান্তে এখানে আসিবার উপযুক্ত হওয়া যায়! পৃথিবীতেই বেশ আছি।

—শ্রীযমদত্ত।

শেষ প্রশ্নের সমাধান

ইঁচড়েই পাকিয়াছিলাম,
তাই শৈশবে চাখিয়াছিলাম
একাধিক আব্‌কারী-
মাল, লয়ে দুই চারি
বন্ধু ও বান্ধবে মোর ,—
ক্রমে হইনু পক্ক নেশাখোর।

বুদ্ধিটি চাষিয়াছিলাম,
ময়- দা মাফিক ঠাসিয়াছিলাম ,—
বুদ্ধির দৌলতে
গদ্যের এ জগতে
বহাইব কাব্যের নদী,
যাহে উর্ম্মি বহিবে নিরবধি।

হালে গঞ্জিকা দহিয়াছিলাম,
আর স্কন্ধেতে বহিয়াছিলাম
কেশ, বীণাহস্তারে :—
কাব্য কি শস্তারে!—
'বলাহক' কবি-জগতের

সুপ্‌সুপা,—কি হেতু ভয়ের!

অপেক্ষাও চিত্রগুপ্ত মনিবকে ভয় করেন—মুখ দূরের কথা আকৃতিও কখনও দেখেন নাই। চোখ বুজিয়াই অনুভব করেন যে সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার হিম হইয়া যাইতেছে—নাড়ী ছাড় ছাড় করিতেছে। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকেন। কিন্তু যমরাজের সেটা চোখে ঠেকে না। কারণ বাঙালী কেরানী ভূতগণ গবেষণা করিয়া বলিয়াছে এটা কেরানীদের জাতি-ধর্ম্ম। আর দেখিয়া দেখিয়া সহিয়াও গিয়াছে। কিন্তু আজিকার কম্পনের বেগ যেন বেশি। তিনি বলিলেন—তুমি এত কাঁপছ কেন হে?

আজ্ঞে—মীটিং হচ্ছে।

যমরাজের ইচ্ছা হইতেছিল যে কেরানীটির মাথায় একটি চাঁটি বসাইয়া দেন। কিন্তু তিনি ছ্যাবলা নন, কোনরূপে আত্ম সম্বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

মীটিং কি?

—আজ্ঞে সভা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ তা জানি, মীটিং মানে সভা সে জানি আমি। সব ভাষা না জানলে এ গদী পাওয়া যায় না জান? চিত্র-গুপ্ত আরও খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন, বলিলেন—আজ্ঞে ভূতেরা—

তাহার মুখের কথায় বাধা দিয়া যমরাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—তাও জানি। এ রাজ্যে ভূতছাড়া আর কি থাকবে? জিজ্ঞাসা করি—তারা বলে কি?

চিত্রগুপ্ত এবার খানিকটা ভাবিয়া লইল। তার পর বলিল—আজ্ঞে সে বোঝা যায় না। নানা ভাষা একসঙ্গে মিশে গিয়ে সে তালগোল পাকিয়ে বসে আছে। কানের পর্দ্দা ফেটে গেল কিন্তু বুঝতে কিছু পারলাম না।

যমরাজ উঠিয়া এদিকের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কানে আঙুল দিতে হইল। কি চীৎকার! অথচ একবর্ণও বোঝা যায় না।—বাঙলা—হিন্দী—ফারসী—আরবী—সংস্কৃত—ল্যাটিন—ইংরেজী— ফ্রেঞ্চ— চীনা— জাপানী— হচমচ— খচমচ— পৃথিবীর আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত সকল দেশের ভাষার একটা বিরাট ব্যাবেল। জানালার মধ্য দিয়া গভীর অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিলেন (মানুষ যেমন দিবালোকে দেখে) প্রেত-সমুদ্র উত্তেজনার বিক্ষোভে গর্জ্জন করিতেছে। এমন সময় এক মেট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মাথায় নিগ্রোদের মত চুল সামনের দিকটা চাঁচা—চোখ দুটি চীনেদের মত—নাক গ্রীকদের অনুরূপ। রং না সাদা—না হলদে। আজ পাঁচশত বৎসর ভাল ব্যবহার করায় এই সেই দিন—অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্বে মেট হইয়াছে। সে আসিয়া নিজের ভাষায় বলিল—

মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে। নরকজাত ভূতগুলো একসঙ্গে চীৎকার করছে।

যমরাজের নাড়ীর গতি বাড়িয়া গেল—প্যালপিটেশন আরম্ভ হইল। প্রশ্ন করিলেন

—কি বলছে তারা?

—আজ্ঞে তা' বোঝা যায় না। কিন্তু যা বলছে তাই নাকি লিখে প্রচার করবে। এবং প্রকাশক হতে হবে আপনাকে।

যমরাজ সকরুণ স্বরে চিত্রগুপ্তকে বলিলেন—চিত্রগুপ্ত! আরও কষিয়া চোখ খুলিয়া চিত্রগুপ্ত কি একটা উত্তর দিতে গেল—কিন্তু বাহির হইল শুধু বু-বু-বু-বু। সে বেচারার হইয়া গিয়াছিল—সে ভাবিতেছিল ভূতব্যাটাদের রাগ ত তাহারই উপরেই বেশি। কারণ

থাকেই. রেকর্ড রাখে। যমরাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একজন মেটকে বলিলেন ডেকে নিয়ে আয় ত কাউকে।

—আজ্ঞে কাকে ডাকব ?

—যাকে সামনে পাবি।

অল্পক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি আসিয়া হাজির হইল। ভূতটি শ্বেতাঙ্গ। যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ?

দৃপ্তভাবে সে উত্তর দিল—আমি নাৎসী।

নাৎসী ?—নাৎসী কি ? যমরাজ ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তবুও প্রশ্ন করিলেন—

কি চাও তুমি ?

—এই প্রেত রাজ্যে ঝটিকা বাহিনী গঠন করতে চাই।

কিছু বুঝিতে না পারিয়া যমরাজ বলিলেন—আচ্ছা যাও তুমি।

সে চলিয়া গেল। যমরাজ বলিলেন—আরও জন কয়েক ডেকে নিয়ে আয়। কিছুক্ষণ পরেই আবার কয়জন আসিল। একজন বলিল—আমি কমিউনিষ্ট।

আর একজন বলিল—আমি লেবার, আমি স্বাধিকার চাই।

অপর একজন বলিল—আমি জাপ। মাঞ্চুরিয়ার ভূতগুলো যেখানে থাকে সেইখানে আমরা কলোনি করতে চাই—ব্যবসা করতে চাই।

অপর একজন বলিল—আমি তরুণ, বাংলাদেশের তরুণ। আমি চাই সাহিত্যিক হতে।

যমরাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তা হও না বাপু। প্রেতরাজ্যের ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান গবেষণা করে লেখ না। আর প্রেতিনীর অভাব নাই—বল না কাকে পছন্দ !

তরুণ দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—আমি লিখব নব সাহিত্য। যাতে থাকবে তোমার এই অন্ধকার অচলায়তন ভেঙে দেবার প্রেরণা। যাতে থাকবে প্রেতলোকের পুরাতন সমাজ ধ্বংসের মন্ত্র। আর আমি চাই এক্সটেম্পোর প্রেম—বন্ধন নাই—বিরহ নাই—ঝকিমকি নাই—

তাহার কান ধরিয়া যমরাজ বলিলেন—এয়ার ছোকরা! ইয়াকি পেয়েছ এখানে?

তারপর কাঁটার ডালটা আস্ফালন করিয়া বলিলেন—নিকাল হিঁয়াসে।

সকলে চলিয়া গেল। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বলিলেন—এক কাজ কর—প্রেতপুরীর ঢাকনিটা ফেলে দাও। প্রেতপুরী একটি বিপুলায়তন কটাহ—মাথার ঢাকনিটা ইথারের মধ্যে পোঁতা একটা হুকে আটকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়! কড় কড় শব্দে ঢাকনিটা নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিধার নীরব হইয়া গেল।—

যমরাজ ডাকিলেন—চিত্রগুপ্ত, আমরা মরলে কোথায় যাব?

চিত্রগুপ্ত বলিলেন—আমাদের মরণ নাই।

যমরাজ হতাশ হইয়া বলিলেন—বল কি!

স্বাস্থ্যকামী: এ জায়গাটা কি বাতের পক্ষে ভাল?

স্থানীয় লোক: নিশ্চয়ই, আমার বাত এখানেই হয়েছে।

নর-দেব রঙ্গিণী

একেলা চলিয়াছিনু হনলুলু-দ্বীপ উদ্দেশিয়া,
সায়ন্তন সার্দ্ধছয়—বুঝিনু ঘটিকা নিরখিয়া ;
অহেতুক প্রীতিভরে ধূলিতে গু'জিয়াছিনু মুখ ;—
ধুপ্ করি' আচম্বিতে সুমুখে দাঁড়ালে খোলা বুক।

দন্তবেষ্ট-প্রান্তে তব পর্য্যুষিত-অন্ন মারে উঁকি ;
অতনু jazz-ইছে, তাই প্রতি+অঙ্গ উঠিছে পুলকি' ;
নয়ন-hasag তব থাকি' থাকি' উঠিছে উদ্ভাসি' ;—
অধরের বৃতি আর লালা ঠেলি 'নিকলিছে' হাসি।

সেই যে তিরাশি সনে গেছিলাম কুবেরের পুর—
কণ্ঠে তব শুনি তৎ-ক্ষণ-শ্রুত চেনা চেনা সুর।
বায়ুভূত নিরালম্ব ছিলে পুপ্ ফুস-লোকে তুমি,
বৃষভানুসুতারূপে এলে বাজাইয়া ঝুমঝুমি।

জীবনের অধ্ব মোর ছিল রুক্ষ ঘুটিঙ-বন্ধুর,
শিশি-গর্ভে কবিরাজ-বটি সম লম্ফিয়া প্রচুর
মসৃণ করিয়া দিলে ;—উত্তেজনাবশে রোমাবলি
ঝরিল পৃথ্বীর বুকে : পৃথ্বী ওঠে পুলকে আকুলি'।

পুঁজের বদলে আজ মধুক্ষরে প্রভাতের তনু ;
অরুণের অরুণিমা উষসীর গলগণ্ড-হনু
চুমিলা ;—মধুর আজি, সব মধুময় দুনিয়ায় ;
বাত মধু, মধু তোর ঋতু-স্নাত লাভা-স্রোত হায়।

কুসুমের ভ্রূণ ছিল মরুভূর জরায়ু বিলীন,
বিকশিল আজি, লভি' চরণ-পরশ তব ক্ষীণ।
টঙ্কায় ভরিয়া গেল আমার ও পরকীয় জেব ;—
দত্ত-কবি দেবী হ'ল, আমি আছি কবিরাজ দেব।

আর, কে

চিঠি

প্রিয় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়,

দোহাই আপনার ঈশ্বরের, আমার পত্রখানি আপনার পীঠস্থ করবেন। আপনারা লিখেছিলেন, দিলীপকুমার ছন্দ প্রস্তুতের জন্য একটি অভিনব কল আবিষ্কার করেছেন। কথাটায় একটু ভুল আছে, তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নি, ক্রয় করেছেন। কোনো প্রাত্নতত্ত্বিকের হাতে পড়লে তিনি অনায়াসে প্রমাণ করতে পারেন যে ওটা আমাদের অতীত ভারতেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত

হয়েছিল। এবার জাপান সে ফরমূ্যলা জেনে নিয়ে কল তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। বর্ত্তমানে যে কলটা আমদানী হয়েছে তার নাম চৌ-মাত্রিক ছন্দের কল। বহু দিন আগে ৺সত্যেন দত্ত এর রূপ দিয়েছিলেন, তাঁর ঝর্ণা কবিতায়। এবার জাপান থেকে আমদানী বলে দেখছেন না কত সস্তায় সবাই হাত পাকাচ্ছে! সেই প্রাচীন রবিঠাকুর থেকে 'আধুনিক' 'শ্যালিকা'রা পর্য্যন্ত। দুঃখ হয় 'ব্যারেট'লিখিয়ে শ্রীমানের আবার এ খেয়াল কেন জাগলো। এ বুঝি নবাগতার প্রতি প্রেমাধিক্যে? আপত্তি ছিল না। কিন্তু জাপানী মাল 'পেলাম আব কিনলাম' হলেই যে মুস্কিলে পড়তে হয়। কল যে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে। পাঞ্চজন্য যে বেসামাল।

তারপর 'কিশমিশ'-চুষা কবির কাণ্ড দেখুন—

ফিরি শুধু। হাতে হাতে। আঘাত খাই
আঘাত কারীরে খুঁজে আকাশে চাই। (শাস্তি)

সম্পাদক মশাই, বেচারী ভবিষ্যৎ এডিট্ করছেন বলে তাকে আপনারা অমন হাতে হাতে আঘাত খাওয়াচ্ছেন কেন বলুন ত?

ছোট বেলা শুনেছিলাম উদ্দীন আর আলী মিঞা সাহেব কবিতা লিখে নাম করেছেন। আরেকটু বড় হয়ে দেখলাম, রবি ঠাকুর আর দীনেশ সেনের ছাপ দেওয়া আছে এঁদের পিঠে। কাজেই এঁরা মস্ত কবি। (আগে ত জানতাম না, ঠাকুর মশাই একটি ছাপমারা Permutation combination কল কিনে রেখেছেন!) মনে আছে ম্যাট্রিক ক্লাসে উদ্দীন সায়েবের কবরের (ছন্দে) ভুল দেখিয়েছিলাম বলে বুড়ো পণ্ডিতের ছাতার মার খেতে হয়েছিল।—বাদিয়া আর বাদিয়ানী! মিত্র মশাইকে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক মুখ কাচুমাচু ক'রে [illegible], বেচারী নিজে এসে ধরলেন

কি আর করি! তা অমন নিজের ঢাক অনেকেই পেটান। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদেরে আর কতদিন টানবেন কবি সাহেব? Current ত fused হয়ে গেছে। সেদিন কবরেজ মশাই বলছিলেন, ভায়া হে, উদ্‌দীন তার বাদিয়ার ঘাটে নাকি নতুন ছন্দ দিয়েছে। বহু চিন্তা ক'রে তবে বুঝলাম সাহেবের কেরামতি। ৬+৬+৮ কে টেনে ৬+৬+৬+৬+৮ করা হয়েছে। আমরা ও তার অনুকরণে দুলাইন আপনার পাঠকদের উপহার দিচ্ছি—

কুকুরের লেজ টানলে সাহের ছ'হাত না হোক্ হয়ত দু'হাত লম্বা
হতেও পারে,
মাথা কি খারাপ? বদ্ধ পাগল না হলেত আর ময়ূর পুচ্ছ বলবে
না কেউ তারে!

আলী মিঞা ভাই বেশ আছেন। কিন্তু এতদিনেও কি মিঞা ভাইয়ের ছন্দজ্ঞান হলো না? গুরুগম্ভীর ১৮ মাত্রার পয়ার লিখতে গিয়ে বুঝি মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় ৬+৬+৮? তাই ত দেখছে, "বঞ্জুল বন কাঁপে—মল্লিকা ঝরে সারা বেলা।" আর "প্রসন্ন শরৎ দিনে নির্মেঘ নিঃসঙ্গ বেলায়।"

"শরতের সোনালি আলোক
দুয়ারেতে হানে করাঘাত
নির্মেঘ আকাশ হতে
আসিয়াছে স্বপন-সওগাত।" (দেশ)

বেড়ে মেঞা ভাই! সোনালি আলোক যে পদাঘাত না করে করাঘাত করেছে এতেই আমরা সন্তুষ্ট! আঘাত অন্যভাবেও ত করতে পারত! পূজা সংখ্যা খুলি আর দেখি মিঞা ভাইয়ের লেখা।

আরেকটা খবর রাখেন? মা দুর্গার সাথে এবার ব্রহ্মা ঠাকুরও মর্ত্তে এসেছেন। বেচারী বুড়ো হয়ে গেছেন। সৃষ্টি ক্রিয়া

আর তেমন ভাবে চালাতে পারছেন না। এদিকে বাঙলায় কবিকুলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। স্বর্গত অতুলপ্রসাদকে ডেকে বুড়ো রবিঠাকুর ত নিজেই বলেছেন, "আমারো যাবার কাল এলো শেষে আজি।" আর দীনেশ সেন বি-এ, ডি-লিট মশাইও বুঝতে পেরেছেন, তিনি হয়ত "অন্তিম শয্যায়।" রবি ঠাকুরের পাশেই দীনেশ সেনের নাম দেখে আশ্চর্য্য হবেন জানি, কিন্তু উপায় কি? এঁদের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করবার জন্য যথেষ্ট কবি চাই। ব্রহ্মা ঠাকুর ঠিক করেছেন, জাপানেই একটি কবি-তৈরী-কলের অর্ডার দেবেন।

ভবদীয়—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহাপাত্র

কবিদ্রোহী

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের "বিদ্রোহী" পড়িয়া রোমক সম্রাট্‌ Caligula সাহেব পাগল হইয়া যান; তখন তিনি যে কয়টি ব্যক্তিকে দংশন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য; ইহাদের আর সকলেই দশদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, কেবল রবীন্দ্রনাথ দৈবযোগে বাঁচিয়া যান। রোমের এই দারুণ সঙ্কটকালে আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু ৺চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া বর্ম্মাবৃত দেহে Appian wayতে দাঁড়াইয়া গোধূলিলগ্নে ইহা সম্রাট্‌কে শোনান। সম্রাট্‌ ইহাতে ভবব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন; কারণ, "Similia Similibus Curantur", "সমঃসমং শময়তি।" Strindberg এবং Nietzscheকে এই কবিতা শোনাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল,

কিন্তু যে ব্যক্তি কবিতা লইয়া ইউরোপ রওনা হইয়াছিল সে লিলুয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পাগল হইয়া যাওয়ায় উক্ত দুষ্কার্য্য সম্ভব হয় নাই।
——কবিতার সংগ্রাহক, "জীমূতবাহন"]

১

আমি ভৈরব হাতে বিষাণ,
    আমি বিষ্ণুর হাতে চক্র,
    আমি মহা-সিন্ধুর নক্র,
আমি দুষ্টের মুণ্ডিত শিরে
    ষষ্ঠী ঘোষের তক্র।

২

আমি অগ্নি, আমি অগ্নি,
    আমি যাহারে বিবাহ করেছি, তাহারি ভগ্নী,
আমি দিনরাত করি খয়রাত,
    করি কারবার লগ্নি।

৩

আমি দেল্‌খোস, আমি দেল্‌ওয়ার,
আমার হস্তে ঘৃণিত নিতি হত্যার রাঙা তলোয়ার,
    আমি ফেরোয়ার, ধূমকেতু মম 'ফলোয়ার',
আমি সূর্য্য চন্দ্র হাতে লুফে চলি,
    আমি তাজ্জব খেলোয়ার।

৪

আমি খোরাসানী ঘোড়া ছুটে যাই টগবগ্‌বগ্‌,
    পচাঘায়ে নালী, জ্বলি আমি চির দগদগ,
    আমি ফিরিঙ্গী, আমি মগ,
আমি 'চায়না সাগরে' 'টাইফুন্‌',
    আমি 'জার্ম্মান ওশানে'-মহা'ফগ' ॥

কাব্য চতুষ্পাঠী

মুরারী দারুময় হইয়া পুরীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর সর্ব্বত্যাগী হইয়া লজ্জানিবারণের জন্ত বাঘছাল মাত্র সম্বল করিয়া শ্মশানে পলায়ন করিয়াছেন—অন্ত পরে কা কথা। সংসারে বাস করা এমনি দুরূহ ব্যাপার। গৃহে অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই, আমারও রোজগারের উপায় এবং ক্ষমতা নাই। সময়ে লেখাপড়া করিলে হয়তো কিছু হইত, কিন্তু তখন সখের থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করিয়া দিন কাটাইয়াছি, ফলে কতকটা মেয়েলী-ভাব দেহে ও মনে প্রকাশিত হইতেছে। এখন আর কি করা চলে। পিতার তিরস্কার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করারও সাহস আমার নাই।

শেষে পিতা একদিন ডাকিয়া কহিলেন—"এমনি করে ঘরের ভাত ধ্বংস করা আর চলবে না—কালই কলকাতা গিয়ে রোজগারের চেষ্টা দেখ। আমি হরিহরকে লিখে দিয়েছি।" হরিহর আমার মেসোমশাই, কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট অফিসের বড় বাবু।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই এই আদেশ আসিল, কিন্তু উপায় নাই। যাইতেই হইল।

কলিকাতায় আসিয়া মেসোমশাইএর মেসে আশ্রয় লইলাম। মেসোমশাই আশ্বাস দিয়া কহিলেন চিন্তার কারণ নাই—কলিকাতার পথে ঘাটে পয়সা ছড়ান থাকে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হইল—আমি আশ্রয় ও আশা পাইলেও বিশেষ ভরসা পাইলাম না।

সেদিন হইতে কলিকাতার পথে পথে পয়সার সন্ধানে ঘুরিয়া

বেড়াইতে লাগিলাম। সকাল নাই, দুপুর নাই, বিকাল নাই অক্লান্ত উদ্যমে পথে পথে ফিরিতেছি কিন্তু পয়সারও কোনো চিহ্ন নাই।

কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। মেসোমশাই টলিলেন—তাঁহার অন্ন আর বেশীদিন তিনি ধ্বংস করিতে দিবেন না জানাইলেন। আমি মরীয়া হইয়া একটা কিছু হেস্ত নেস্ত করিবার চেষ্টায় বাহির হইলাম। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া চলিতে চলিতে অনেকগুলি সিনেমা গৃহের সম্মুখে জনারণ্য ভেদ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইতেই যেন মনে একটু আশার সঞ্চার হইল—কেমন যেন একটা "অকারণ পুলক" অনুভব করিলাম। কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখি যে মনে কাব্য-রস জাগিয়াছে। কারণ একটু দূরেই দেখিলাম একটি বড় সাইন বোর্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে বড় বড় হরফে লেখা—"কাব্য চতুষ্পাঠী"।

থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করিয়া "ষ্টেজ-ফ্রী" হইয়াছি, অপ্রতিভ হইবার ভয় নাই—সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম। একটি বড় ঘরে পরদা ঝুলিতেছে, ঈষৎ তুলিয়া দেখিলাম লোকে পরিপূর্ণ। আলমগীরের কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি ভিক্ষাকারিণী উদিপুরী বেগমের কায়দায় কহিলাম—"আসিতে পারি কি আমি?"—দুইচারজন এক সঙ্গে যেন গান করিয়া উঠিলেন—"রয়েছে খোলা এ দ্বার মম"—বুঝিলাম ইহারা যথার্থই কাব্য-চতুষ্পাঠীর লোক বটে। ঢুকিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে জানিলাম উপস্থিত বেশীর ভাগ নূতন পত্রিকার সম্পাদক—চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের লিখিত কবিতা ক্রয় করিতে আসিয়াছেন—টিকা মূল্য দুই আনা। সম্মুখে গালিচা পাতা তাহার উপর দুইজন

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন—অনেক চেষ্টা করিয়া নিজেদের চেহারাটিকে তরুণ রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। মাথায় কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, চাঁচা ছোলা মুখ, সিল্কের পাঞ্জাবী, এসেন্সের গন্ধ, সবই আছে। তাঁহাদের পিছনে দেওয়ালের কোণে দেখিলাম একটি তার-ছেঁড়া, তলাভাঙা তানপুরা রহিয়াছে ও তাহার পাশে পোকায়-কাটা একটি সৈনিকের পোষাক রহিয়াছে। বুঝিলাম ইঁহাদের একজন বোধ হয় কালে গানের চর্চ্চা করিতেন, অপর জন সামরিক বিভাগে ছিলেন—বর্ত্তমানে চতুষ্পাঠীর কর্ত্তা।

গালিচায় উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ তিনি কহিলেন—"ফরমাস মত কবিতা লিখতেই আমাদের তরুণ ও তরুণী সভ্য ও সভ্যরা অভ্যস্ত—আপনার ইচ্ছামত কবিতা আপনি পাবেন। ইহাতে বুঝিলাম এখানে তরুণীদের সমাগম হইয়া থাকে—তবে আর কি! ইহাও লক্ষ্য করিলাম এই ভদ্রলোক কথা কহিবার সময়ে তো বটেই, তাহা ছাড়া প্রায় সর্ব্বদাই হারমোনিয়ম অথবা বেহালা এস্রাজ বাজাইবার ভঙ্গিতে অঙ্গুলী সঞ্চালিত করিতে থাকেন—যেন মহাসমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে—শুনিলাম তাহা স্পিরিচুয়াল টরেটক্কা—আত্মার সহিত পরমাত্মার কথোপকথন। ইহাতেই ইনি কাব্যোদ্দীপনা লাভ করেন।

ভজহরি বাবুকে তিনি পায়রা-খোপ হইতে ফাইল বাহির করিয়া দেখাইলেন—প্রথম কবিতা, একটি তরুণী সভ্যার, তিন রকম ছন্দে লেখা। ইনি নূতন। ভজহরি বাবু গদগদ হইয়া কবিতাটি পড়িতে লাগিলেন :—

গুল্ বাগেতে ফুল্ ফুটেছে ভ্রমরা ফোটায় হুল্
তুল্‌তুলে গাল্ ফুল্ বালাদের চোখ্ করে ঢুল্‌ঢুল্।

কালো কালো চুল্ যেন কালো ঝুল্ বাতাসে পড়েছে খুলে
দোলে দুল্‌দুল্, কানে লাল দুল্ আপনা আপনি দুলে।
কোন ফুলে বসি ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে গান গেয়ে এল বুল্‌বুল্
কোন ভুলে আজ দ্বার খোলো বলি মানস করে যে চুলবুল।

ইহার পর একটি তরুণ সভ্যের লেখা কবিতা পাঠ করা হইল—

পান খেয়ে প্রাণ করে আন চান
বাণ মারে যেন প্রাণে
ডান দিকটায় টান পড়ে কার
গান গায় কেবা জানে!
ছল ছল করে নয়ন প্রিয়ার
টল টল করে গাল,
পায়ে বাজে মল চলে সখি দল
রসিক হয়েছে ঘাল।
কাণ দেয় ডাক টাক চুলকায়
নাক ফুলে' হয় ঢাক
খেয়ে দিশী মাল ছাগ এক পাল
হাঁকিতেছে "Good Luck"।

ভজহরি বাবু খুসী হইয়া দুইখানি-ই লইলেন এবং মূল্য স্বরূপ একটি সিকি রাখিয়া বিদায় হইলেন।

আমি বিস্মিত হইলাম। রোজগারের এমন সহজ পন্থা থাকিতে এতদিন আমি কি নাকাল হইয়া ঘুরিতেছিলাম। এমন সময় সেই গৌরবর্ণ ভদ্রলোকটি কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোকটিকে কহিলেন—দেখুন তো বুলবুল বাবু, "ইনি কি চান।" আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় আমি সবিনয়ে কহিলাম—"আমি আপনাদের সভ্য হ'তে এসেছি"—

উভয়েই "বেশ বেশ" করিয়া অনুমোদন করিলেন। এমন সময়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিতেই ঘরস্থ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা, করিয়া নমস্কার করিলেন—বুঝিলাম ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। একজনকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"বলেন কি? এঁকে চেনেন না। ইনি হরিনন্দন বাবু প্রকাণ্ড মাসিক পত্র আর গ্রন্থালয়ের মালিক।" মনে হইল এরূপ মহাশয় ব্যক্তিকে না চেনাটা অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। সেই গৌরবর্ণ ভদ্রলোকটি (এতক্ষণে তাঁহার নাম জানিলাম, ভবঘুরে) হরিনন্দন বাবুকে বসাইয়া খোপ হইতে একখানি কবিতা বাহির করিয়া কহিলেন শুনুন—

সার্দ্ধ প্রহর উর্দ্ধে থাকিয়া 'নেবুলা বাষ্প পান করি'
স্তিমিত আলোকে রন্ধ্র ভেদিয়া ঘন ঘন পড়ে ঘাম ঝরি'।
প্রলয় বহ্নি দাউ দাউ জ্বলে উষ্ণ আহুতি sip কর
বিস্মরণের প্রদোষ আঁধারে থেকে থেকে তুমি skip কর।
হে মোর চিত্ত তীর্থ করেছ 'শ্বাস্-প্রাণায়াম' শিখেছ তুমি।
উর্দ্ধে উঠিবে, 'হংস-ডিম্ব' ভূমার এবার রবেনা ভূমি।
ত্রস্তে ছুটিতে বক্ষ হইতে বস্ত্র খসিল সুন্দরীর
যৌবন-মনা তরুণ-চিত্ত কেমনে বলনা রহিবে স্থির।
ক্ষিপ্ত মদন অন্তর মাঝে, ক্ষুধার দীপ্তি উঠিল ভাসি
ছিন্ন করিয়া অস্থি-তন্ত্রী নিষ্ফলতার বাজিল বাঁশি।—

হরিনন্দন বাবু সোৎসাহে কহিলেন—চমৎকার! সত্যই কেঁদে ফেলায়, মতই করুণ হয়েছে বটে। তা' এটাই দিন—

হরিনন্দন বাবু এটি দুই আনায় খরিদ করিলেন।

এইভাবে কবিতা-বিক্রি শেষ হইলে একদল আমাকে চঠাৎ

প্রশ্ন করিলেন—"সূতা" মেলাও। আমি প্রশ্নটি না বুঝিতে পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে একজন আমাকে পা হইতে একপাটি জুতা খুলিয়া ইঙ্গিত করিলেন—আমিও তৎক্ষণাৎ বলিলাম "জুতা"। প্রশ্নকারী বলিলেন—ঐ ঘরে যাও। আদেশমত ঘরে গিয়া দেখি কবিতা লিখবার যত প্রকার আয়োজন সবই এখানে সজ্জিত রহিয়াছে—দেখিবামাত্র প্রেরণা জাগিল।

সুন্দরী মম পার্থিব-প্রিয়া
পূজিব তোমায় কি দিয়ে আজি ?
পঞ্চশরের পাঁচ রঙা ফুলে
ভরিয়া এনেছি তরুণ সাজি—
লহ লহ তুমি উপহারগুলো
গাঁথ মালা, আন রঙীন সূতা,
আমি বসে বসে পালিশ করিব
তোমার পায়ের ক জোড়া জুতা।

আর লিখিতে হইল না। ইহাতেই কাজ হইল—আমি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলাম, এবং এই কবিতা বাবদ দুই আনা এবং তৎসঙ্গে "কাব্য-কোষ" নামক একখণ্ড পুস্তক পাইলাম। পুস্তকের প্রথম পাতায় সাধারণ নিয়মগুলি দেখিলাম—

১। মিলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, (কটন-মিল্ নয়) আ, ই, উ, এ, অথবা ইয়া, ইচ্ছামত যোগ করা চলিবে।

২। অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখা নিষ্প্রয়োজন। লৌকিক বিদ্যা-বুদ্ধিতে যেখানে অর্থ পরিষ্কার হয় না সেখানে বুঝিতে হইবে যে

পারলৌকিক জগতের আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। বস্তির ভাব না খোলে উপনিষদের ভাব যোগ করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া ইহার 'শব্দ-কোষ' বলিয়া একটি অংশ আছে—যাহাতে কতকগুলি নূতন কথা সৃষ্টি করা হইয়াছে—ইহা লইয়া কাব্য-রচনা করিলে পরিশ্রমের লাঘব হয়। যেমন—

'লি' বা 'লী'-কারান্ত কথা—অলি, কলি, গলি, চলি, ছলি, নলি, ফলি, বলি, মলি, ঝলি, খেয়ালী, দেয়ালী, শেয়ালী—ইত্যাদি

'আল'-অন্ত—কাল, মাল, গাল, ঘাল, চাল, ছাল, জাল, ঝাল, টাল, ডাল, নাল, ফাল, মাল, থাল, হাল, শাল,—ইত্যাদি।

মুগ্ধ হইয়া এইখানি পড়িতে পড়িতে মেসোমহাশয়ের মেসে ফিরিলাম। সেইদিন হইতে আমার বেকার অবস্থা ঘুচিয়াছে, এখন মাসে প্রায় পাঁচ টাকা আয় করিতেছি।

—শ্রীশম্ভুশূলী শর্ম্মা

চিড়িয়াখানায় ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করিল—জিরাফের ঘাড় এত লম্বা কেন?

জিরাফ-রক্ষক অনেক ভাবিয়া উত্তর দিল—জিরাফের মাথা তার দেহ থেকে কত দূরে দেখছ না? সেই জন্যেই লম্বা ঘাড় দরকার।

সংবাদ-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশকে বঙ্গমাতা রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথও এক সময় বঙ্গদেশকে মা বলিয়াই ডাকিয়াছেন। অবশ্য প্রকৃত দেশসেবা দেশকে মা বলা বা না বলার উপর নির্ভর করে কিনা জানিনা, কিন্তু দেশসেবা হউক বা না হউক মিথ্যা মোহ দূর হইয়াছে। মা বলিতেই মোহ আসে কাজ করা হয় না, যাহারা গর্ভধারিণীকে মা বলিয়া ডাকে তাহারাও মায়ের প্রকৃত সেবা করিতে পারে না।

—

কিন্তু ইহা নিতান্তই অবান্তর। আসল কথা দেশে সিনেমা আসিয়াছে। দেশকে এখন আর মা বলিবার দরকারই নাই। সাহিত্য-কর্ম্মীগণ দেশ সম্বন্ধে মোহমুক্ত হইয়াছে, এখন প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। পূজা উপলক্ষে কতকগুলি কাগজে এই মোহমুক্তির সংবাদ পাইতেছি। মাতৃ আরাধনার পরিবর্ত্তে বারবধূ আরাধনা। দুর্গাপূজা সংখ্যায় বিশেষ করিয়া "দুর্গা" বাইজি বা অন্য কোনো পূর্ণ উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ নটী-মূর্ত্তি দ্বারা মঙ্গলাচরণ। অবশ্য দুর্গাপূজা মানে দুর্গ মূর্ত্তি পূজা নাও হইতে পারে, এবং যাহারা হিন্দু নহে অথবা হিন্দু হইয়াও অন্তত কাগজে ছবিছাপা সম্বন্ধে মামুলি সংস্কারের বিরোধী তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই, কিন্তু যাহারা পূজা ব্যাপারটাকে পূজার সময় বিদ্রূপ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লয় এবং কাগজের মলাটে বা ললাটে "দুর্গা" বাইজি বা "উমা" শশীর ছবি ছাপাইয়া তাহাই মাতৃমূর্ত্তি হিসাবে

চালাইতে চায়, তাহারা সত্য সত্যই সত্যকাম। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বেশ্যারূপেন সংস্থিতা—তাহার পূজারীদের আর যাহাই থাকুক সংস্কার নাই।

—

কিন্তু অর্দ্ধাবৃত বা অনাবৃত বারবধূ মূর্ত্তির কি সার্থকতা নাই? পূজারীদের মতে হয়ত ইহা বঙ্গের বা ভারতবর্ষেরই মূর্ত্তি। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই পূজারীরাই যথার্থ দেশ-প্রেমিক। দেশকে জননীরূপে পূজা করিতে গেলে পূর্ণ প্রেরণা আসেনা, মাতাকে উপার্জ্জনের সামান্য অংশই মনিঅর্ডার করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বারবধূ-সম্পর্কে কৃপণতা থাকে না, যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া লোকে বারাঙ্গণা পূজা করে। "বঙ্গ আমার, বেশ্যা আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"—এই কথাটা তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলেনা বটে, কিন্তু ছবি ছাপাইয়া প্রমাণ করে।

পূজা সংখ্যা একখানা মাসিক পত্রের প্রথম রঙীন ছবি—একটি ওয়াইন-গ্লাসের সঙ্গে ফির্পো হোটেল এবং বাঙালী মেয়ের mix-up. কাগজখানির নাম "ভবিষ্যৎ"। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। যুরোপীয় বর্ত্তমানের ক্যারিকেচারকে ভারতবর্ষীয় ভবিষ্যৎরূপে কল্পনা করায় ইঁহাদের কৃতিত্ব। যুরোপ-দর্শনের চমকলাগা ধাক্কা সামলানো গেল না—তাই "ব্রথেল" স্বর্গ বলিয়া প্রতিভাত! রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রদর্শনের এরূপ বিপর্য্যয়কারী প্রতিক্রিয়া তাঁহারই পাশের ঘর হইতে প্রকাশিত হইল কেন তাহা ভাবিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে

double cross করিয়া ইহারা রবীন্দ্রনাথের অগম্য এবং অকল্পিত স্থানে পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে উত্তীর্ণ, ইহারা তেমনি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য বিশ্বপৃথিবী, ইহাদের লক্ষ্য বিশ্বকাল। বিশ্বপৃথিবী বিশ্বকালের অধীন; রবীন্দ্রনাথ হার মানিলেন।

কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশধরের দুর্দ্দশা কি আজ এতদূরই পৌঁছিয়াছে যে কেহ বাঙালীমেয়ের সঙ্গে ফির্পোতে বসিয়া মদ্যপান করিবে ইহাও তাহার স্বপ্ন! দশটি টাকা খরচ করিলে যে স্বপ্ন সত্যে পরিণত করা যায় তাহাকেই আজ সে তাহার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের লোলুপ দৃষ্টিতে মহার্ঘ মনে করিতেছে! এই স্বপ্নের রূপ দিবার জন্য তাহার কত তোড়জোড়, কত আয়োজন! বিলাতি সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে এরূপ কোনো কোনো বাঙালী মহিলা পূর্ব্বেও মদ্যপান করিয়াছেন, এখনও করেন। ইহা বাঙালী জাতির প্রার্থনীয় ভবিষ্যৎ ত নহেই, অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎও নহে। ইহা ভবিষ্যৎই নহে। হুইস্কির পেগ ঢালিয়া মাসিক পত্রিকায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিলেও ইহার নাম ভবিষ্যৎ নহে।

—

দুই চারি পয়সা করিয়া কোনোরকমে একপেগ মদের দাম যোগাড় করিলে উহা বঞ্চিতের স্বপ্ন সফল করিতে পারে, কিন্তু এই ভারতবর্ষের ঠাকুরগণ না হইলেও দেবতাগণ এককালে জালা জালা মদ্যপান করিয়া চকির মত ঘুরপাক খাইয়াছেন. সুতরাং

এদেশের পক্ষে উহা "ভবিষ্যৎ" নহে "ভূত"। ক্ষীরোদবাবুর ফতিমা বিবি রাশি রাশি টাকা পাইলে প্রাণ ভরিয়া মুড়ি কিনিয়া খাইবে এইরূপ একটা পরম সুখকর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিল; কিন্তু এরূপ স্বপ্নের দ্বারা প্রহসনের সৃষ্টি হইতে পারে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয় না।

—

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরূপ সহজ কল্পনা আর দেখি নাই। বাঙালী সন্তান ফুটপাথে বসিয়া গণৎকারের ব্যবসা করেনা বলিয়া আমরা অন্যত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আর আমাদের দুঃখ নাই, সুভো ঠাকুর বাঙালীর ভবিষ্যৎ গণিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যতের স্ত্রীলোক বলিতেছে—

> আজ আমার বলতে লজ্জা নাই বিনায়ক, স্বামী মরে আমায় বেশ একটা গা ঢালা মুক্তি দিয়ে গেছে; বিয়ের পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম যে সিঁথির সিঁদুর শুধু মাথাকেই ভারী করে না, মনকেও জখম করে; এদেশের বিয়েতে হৃদয়ের শ্রাদ্ধবাসরে দেহ দেয় মনের পিণ্ডদান।

শুধু মনের পিণ্ডদান কেন? দেহও কি মাঝে মাঝে দেহের পিণ্ড দান করেনা? যে পিণ্ড নড়িয়া চরিয়া বেড়ায় কথা বলে এমন কি লেখেও? কিন্তু বংশের পাপ মোচন করা আবশ্যক।

—

সেই জন্যই ত বঙ্কিমচন্দ্র গেলেন এবং তাঁর সিংহাসনে—

> বাহাল হলেন রবিঠাকুর! লোকটার ভাষা জ্ঞান ছিল! তবে Lake Poetদের মত abstract কিছু

> লিখতে গেলেই বড় dull হয়ে পড়তেন! যাহোক জীবিত অবস্থাতেই এই বুঢ়া কবিকে অকর্ম্মণ্য বলে তালাক দিয়ে, গদিতে বসান হল শরৎচন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে!……সম্রাটের পর সম্রাট আসতে লাগল কিন্তু সাম্রাজ্ঞী কে হবেন ঠিক হল না!

রবীন্দ্রনাথ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ঘরের লোকের নিকট এতটা dull হইয়া রহিয়াছেন তাহা আমরা জানিতাম না। যাহা হউক এইবার তাঁহারা যদি সাহিত্য সম্রাটদের জন্য সাম্রাজ্ঞী জুটাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগ যে একটা dullnessএর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

—

গত ৫ই জানুয়ারির ভূমিকম্পে যে প্রাসাদ ধ্বংস হয় নাই, সে প্রাসাদ যে চিরকাল থাকিবে না একথা আমরাও বুঝিতে পারি। জমিদারি এযুগে প্রায় অচল। পূর্ব্ব যুগের কৃতিত্বে যে সব সৌধ উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারসন্তানগণ লাভ করিয়াছেন সেইগুলি ভূমিসাৎ হইলেই "Afoot and light-hearted I take to the open road" গাহিতে হইবে। কিন্তু এটুকু বুঝিতেও কল্পনার পরিধি খুব বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। "ভবিষ্যৎ" বলিতেছেন—

> অদিতি একটা সিগারেট তার লিপষ্টিক-লাল ঠোঁটে আটকে দিয়ে বল্লে—পুত্র বাৎসল্যের instinct, জন্তুদের মধ্যেও আছে। কুকুর, বেড়ালও ত তাদের বাচ্ছাদের নিজে না খেয়ে খেতে দেয় দেখেছি—মানুষ

> তা হ'লে superior কিসে? ভবিষ্যতের বালকরা কোন ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে বড় হবে না—নিজের ভার তারা নিজেই নেবে এ আমি বলে দিলুম।

জানি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণটা গর্ব্বের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলে লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের ভার নিজেই লইবে কেমন করিয়া ইহা বুঝিলাম না। বালক, পাওনাদার ঠেকাইবে কি উপায়ে? উপরের যুক্তিতে ইহাও প্রমাণ হইল না যে মানুষ তাহার দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া একদিন প্রেতাত্মা হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে। দেহ যতদিন আছে পশুর সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে তাহার ঐক্যও ততদিন থাকিবে। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত abstraction, এবং যে abstractionএ রবীন্দ্রনাথ dull—ইহা তাহার প্রতিবাদ?

ভবিষ্যৎ মিথ্যা-আবরণ উন্মোচনে হাতে খড়ি দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। এ অবস্থায় উল্লাস একটু অধিক হওয়া স্বাভাবিক; মানুষ যে পশু হইতে superior, সবান্ধবে পরনের কাপড় খুলিয়া ফেলিলে তাহাও প্রমাণ হয়। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বলেন—

> নগ্নতা সম্বন্ধে আলোচনার গন্ধ পেয়ে, এদেশের সভ্য সমাজ হয়ত প্রেতের ভয় পেতে পারে!—শত সংস্কারের গিঁটগুলকে আরো জোরসে জট পাকিয়ে তুলে চেঁচাতে পারে—এটা হচ্ছে নিছক বর্ব্বর প্রচেষ্টা। ...মিথ্যা আবরণের মোহ এখনো যে আঠার মত সেঁটে আছে তাদের [illegible]! তাঁরা খুব ভালরকম

> জানে…তাদের তত্ত্ব তাদের দেশকে কতখানি পিছিয়ে রেখেছে, অন্য উন্নত দেশ থেকে! তবুও একগুঁয়ে খোকার মত জেদের বশে ওই তত্ত্বগুণের চুষি কাঠি চুষেই মরা চাই!

আবরণ থাকিলে কেবল তত্ত্বগুণেরই চুষি কাঠি চুষিতে হয়, ইহাই ভবিষ্যতের দুঃখ। কিন্তু লেহন বা শোষণ সম্বন্ধে যে রুচিভেদ থাকিতে পারে ইহা কি ভবিষ্যতের অজ্ঞাত? তাঁহারা যাহাতে খুশী অন্যে তাহাতে খুশী নাও হইতে পারে।

যে কোনো প্রাণীর আহার বিহার এবং বাসস্থান সম্বন্ধে একটি মূলনীতি আছে—তাহাকে উড়াইয়া দিতে খুব সম্ভব স্ৰভো ঠাকুর কম্পানি পারিবেন না। উৎসাহের আতিশয্যেই মানসিক বিপর্য্যয়, না মানসিক বিপর্য্যয়ের ফলেই উৎসাহের আতিশয্য ইহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। কারণ, আবরণ যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে নগ্নতাও মিথ্যা। আবরণের মূল্য শিশুর কাছে এবং উন্মাদের কাছে নাই, সুস্থ সবল ব্যক্তির কাছে আছে। মানুষের জীবনে দুইটিই সত্য। মানুষ আলোচনা করিয়া নগ্ন হয় না, দরকার হইলে স্বভাবতই হয়। ইহা সভ্যতাও নহে, বর্ব্বরতাও নহে, ইহা জীবন ধারণের একটি মূল নীতি। নগ্নতা-আলোচনা দ্বারা নিজেকে হঠাৎ এত অগ্রগামী ঠাওরাইয়া আস্ফালন করা কেন? উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে এদেশে কেহই বর্ব্বর বলে নাই। এদেশের বহু দেবদেবীর উলঙ্গ চিত্র রহিয়াছে, তাহাকেও কেহ বর্ব্বর বলিতেছে না। তদুপরি যে দেশের মন্দিরের গায়ে উগ্র উলঙ্গতার চিত্র রহিয়াছে সেদেশে বসিয়া হঠাৎ নিজেকে

যুগপ্রবর্ত্তককারী বলিয়া কল্পনা করিলে লেখকের মানসিক কুশলতা সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা হয়। আর যাহাই হউক নাঙ্গা পর্ব্বতের দেশে নব নগ্নতার যুগ প্রবর্ত্তনের কর্ম্ম খুব সহজ নহে।

—

তারপর ভবিষ্যৎ বলেন—

> এই দুর্ব্বলতাকে (?) আড়ালে রাখবার জন্যই তাদের যেন যত কিছু কায়দা……মান্ধাতা আমলের মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই তাদের যেন একমাত্র সম্বল!

পূর্ব্বপুরুষ যে মাটি কামড়াইয়াছে—সে মাটি যদি নিলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে অবশ্যই "মান্ধাতার আমলের" মাটি কামড়ানোব কোনো অর্থ নাই, কিন্তু যাহা লোকে আড়ালে রাখে তাহাই যে লোকের দুর্ব্বলতা ইহার কোনো প্রমাণ নাই।

তবে ভবিষ্যতের কবিত্বের নিকট আমরা পরাভূত হইলাম।—

> * * খোলা আকাশ বুক চেতিয়ে পড়ে আছে —একেবারে নিরাভরণ! আবরণের বালাই নেই— যার জন্যে জমাট ভালবাসা গলে উঠে দুটো বাহু তার বাড়িয়ে দ্যায়—যখন হঠাৎ চোখে পড়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হতে তফাৎ কোরে বাখার জন্যে নিজের পাঞ্জাবীর কোণটা! আর অম্নি হ'য়ে উঠি আমরা কৃত্রিম সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন!

আকাশ "আভরণহীন," চেতনার কোনো বিশেষ অবস্থায় মনে হয়

বটে কিন্তু উহাকে 'বুকচেতিয়ে' পড়িয়া থাকা অবস্থা আমরা কখনো দেখি নাই। কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহার সন্ধান ভবিষ্যৎ দিবেন। ভালবাসা "গলে উঠে" দুইখানি হাত বাহির করে যে বাড়িতে সেই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

ভবিষ্যৎ যাহাকে কৃত্রিম বলিতেছেন, অর্থাৎ ধুতি আর পাঞ্জাবী, ইহা আবিষ্কার করিয়াই মানুষ সভ্য হইয়াছে। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবী এমন জটিলভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে হাজার টানাটানি করিলেও উহা আর খুলিবে না। উহা বহু দিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিব্যক্তি। নগ্নতা আদিম, মানুষ সে অবস্থা পার হইয়া আসিয়াছে, সেখানে ফিরিবার উপায় তাহার আর নাই। যুবক যেমন ইচ্ছা করিলেই শিশু হইতে পারেনা, অত্যকার মানুষ তেমনি পূর্ব্বকালে ফিরিয়া যাইতে পারে না। নগ্নতা সম্বন্ধে শিশুর মত সরল হওয়াই অস্বাভাবিক। যুবক যদি শিশু হয় কিংবা বৃদ্ধ যদি যুবক হয় তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক হয়। শিশু শিশু থাকিবে, যুবক যুবক থাকিবে—হঠাৎ যুবক শিশু হইবে কেন? মানুষের তিনটি বিভিন্ন বয়সের মধ্যে যদি কিছু ঐক্য থাকে তবে জানিতে হইবে সেইটুকু মাত্রই প্রকৃতির ব্যবস্থা। তেমনি বর্ত্তমান মানুষ আদিম মানুষের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে হয়ত ঐক্য রক্ষা করিয়াছে—সেই ঐক্য চিরকালই থাকিবে। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের সঙ্গে সমান হইতে গেলে তাহা অস্বাভাবিক হইবে। হইতে চাহিলেও হওয়া যাইবে না। কেহ

কেহ হইতে পারে—যেমন অনেক যুবক শিশু হইতে পারে। তাহাদের বাসস্থানের পক্ষে একমাত্র ঝাড়গ্রামের বোধনা নিকেতনই যথেষ্ট। বর্ত্তমানে যাহারা 'আদিম' হইতেছে তাহাদের মধ্যেকার নাজা সম্প্রদায় রাঁচিতে এবং অবশিষ্টাংশ যথারীতি জেলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

—

ইংরেজি 'assume' শব্দটির উচ্চারণ লইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে আলোচনা হয়। কেহ বলিয়াছেন "ashume", কেহ বলিয়াছিলেন "as-sume". জনৈক রসিক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন ডিনারের পূর্ব্বে উহা সর্ব্বদাই "as-sume"—কিন্তু ডিনারের পরে "ashume". ইংরেজি ডিনার খাওয়া শেষ করিলে জিহ্বার জড়তা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। অপর এক ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া টলিতে টলিতে দরজা খুলিয়া তাহার ভিতরে ঢুকিল এবং তৎক্ষণাৎ অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া ট্যাক্সি-চালককে জিজ্ঞাসা করিল "How 'mush'?" অর্থাৎ তাহার ধারণা সে ইতিমধ্যে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে।

এদিকে ভবিষ্যতের "এডিটোরিয়াল"-এ দেখিতেছি—

> সরস্বতীকে শিখণ্ডীর মত খাড়া করাই—এবং বিজ্‌নেস্‌ শাক্‌শেস্‌-ই যাদের আদর্শ; তাদের কথা এখানেই দাঁড়ি টানা থাক।

এই "শাক্‌শেস" দেখিয়াই উপরোক্ত গল্প দুইটি মনে পড়িয়া গেল। সরস্বতীরও "শরশ্বতী" হইবার আশঙ্কা ছিল—কিন্তু খুব বাঁচিয়া গিয়াছে!

কিন্তু শুধু যে উচ্চারণ গোলমাল হইয়া যায় তাহা নহে, অর্থসঙ্গতিও থাকে না। যথা—

…কিন্তু তবুও সেই অকাল মৃত্যুর জন্ম আপশোষ করবার কিছুই থাক্‌তো না, যদি তাদের রাখতে পারতো আদর্শকে বজায় ক'রে।

বাচালতা এবং বেচাল-তা একত্র হইলেই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে। কিন্তু ভবিষ্যতের যদি নগ্নতাই কাম্য হয় তাহা হইলে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যার নগ্নতা ঢাকিবাব জন্ম এত চেষ্টা কেন?

—

তবে আমরা জানিয়া ধন্ম হইলাম যে—

—'ভবিষ্যৎ' স্বভোঠাকুর এডিটু ক'রেছেন—
আর দু'শো উনষাট নম্বর আপার চিৎপুর রোড
………থেকে তিনিই ছাপিয়ে পঁইত্রিশ-ঈ
কৈলাশ বোস ষ্ট্রীটএর……হাউস হ'তে বের ক'রেছেন।

'ক'রেছেন' কথাটা 'কোরেযেন' পড়িতে হইবে। তিনিই ছাপাইয়াছেন তিনিই এডিট করিয়াছেন, আশ্চর্য্য! এরূপ সচরাচর হয় না।

—

কাশীধাম হইতে প্রকাশিত সাধন-পন্থা নামক একখানি নব প্রকাশিত মাসিকপত্র পাইয়াছি। আশ্বিন সংখ্যায় কেদারনাথের কবিতা, অধ্যাপক প্রভাত চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ, দরবেশের গান, যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধ এবং আরো অনেকগুলি ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, লিখিত "লিঙ্গ রহস্য" নামক প্রবন্ধটি লইয়া কিঞ্চিৎ

আলোচনা করিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে "লিঙ্গ-উপাসনা" ভারতবর্ষের একটি কলঙ্ক, কিন্তু প্রবন্ধ লেখক প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে প্রবন্ধ লিখিয়া ইহা খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণের ভাষা স্বভাবতই একটু জটিল হইয়া থাকে, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষাভঙ্গি প্রায় সর্ব্বত্রই সরল। কিন্তু তথাপি কঠিন তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিতে গেলে উপযুক্ত শব্দের অভাবে হয়ত নিজেকে উত্তমরূপে প্রকাশ করা যায় না। ইহা লেখকের অপরাধ ততটা নহে যতটা ভাষার। তাই আমরা এই প্রবন্ধটির অনেক জায়গা বুঝিতে পারি নাই। শব্দার্থ সরল, কিন্তু বাক্যার্থ জটিল। খুব সম্ভব অল্পপরিসরে এতকথা বলিতে গিয়াই এইরূপ হইয়াছে, অথচ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা সাধারণের ভ্রান্তি অপনোদন করা যে একান্তই প্রয়োজন এবিষ:য় কাহারো মতভেদ নাই।

—

"বিন্দু যখন বিসর্গরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ যখন দ্বৈত জগতের মূল দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হয় তখন একটী বিন্দু উপরে এবং অপরটি নীচে প্রপতিত হইয়া থাকে। এই দুইটী বিন্দুর সংযোজক রেখাই অক্ষরেখা বা ব্রহ্মসূত্র। উপরের বিন্দুটী একটী ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু। তদ্রূপ নীচের বিন্দুটীও অপর একটী ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু। যখন ঊর্দ্ধ ত্রিকোণ এবং তন্মধ্যস্থ বিন্দু বিক্ষুব্ধ হয়, তখন ঐ বিন্দু হইতে অধোমুখে শক্তির ধারা অবতীর্ণ হয়। ইহাই সৃষ্টি অবস্থার সূচনা। তদ্রূপ যখন অধঃস্থিত বিন্দু এবং ত্রিকোণ বিক্ষুব্ধ হয় তখনও বিন্দু হইতে ঊর্দ্ধমুখে শক্তির ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহা সংহারের অবস্থা। সৃষ্টির সময়ে যে শক্তির ধারা ঊর্দ্ধবিন্দু হইতে অধোদিকে নামিয়া আসে তাহাকে অধঃস্থিত ত্রিকোণ ক্ষেত্ররূপে আপন বক্ষে

ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রাকৃতিক দেহ নির্ম্মিত হয় এবং অজ্ঞানময় প্রপঞ্চের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অধোবিন্দু যখন উর্দ্ধলিঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধমুখে শক্তির সঞ্চার করে তখন উর্দ্ধস্থিত ত্রিকোণ ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া উহাকে বীজরূপে ধারণ করে। ইহার ফলে অপ্রাকৃত বা দিব্য প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়।"

—উর্দ্ধবিন্দু অধোদিকে নামে কেন এবং অধোবিন্দু উর্দ্ধলিঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় কেন ইহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিলাম না।

—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় বিচিত্রায় যখ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে "সংস্কৃতে যাকে বলতো যক্ষ তারই বাঙলা অপভ্রংশ হচ্চে যখ।" কথাটি মূল্যবান। সত্যও বটে। চৌধুরী মহাশয়ের মতে "আমাদের মুখে যে স্বধু যক্ষ যখ হয়ে গিয়েছে তাই নয়; তার রূপগুণও সব বদলে গিয়েছে।" ইহার একমাত্র প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন—"সংস্কৃত যক্ষের কি রূপ ছিল আমি জানিনে।"

—

তারপর গুণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "তাদের (যক্ষদের) একটি গুণের কথা সকলেই জানে। তারা ছিল সব ধন রক্ষক। বাংলা দেশে যক্ষ জন্মায় না। তাই যখ লোকে বানায়; ধনের রক্ষক হিসেবে।"—স্থতরাং "যক্ষ" এবং "যখের" গুণ যে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে এবিষয়ে আর সন্দেহ কি?

অতঃপর চৌধুরী মহাশয় যখ-দেখার দুইটি গল্প বলিয়াছেন। প্রথমটি সম্বন্ধে তিনি ভূমিকা করিয়া বলিতেছেন—"আমি একবার একটা যখ দেখেছিলুম—কোথায়, কি অবস্থায় তার ইতিবৃত্ত একটি গল্প আকারে প্রকাশ করেছি।" দ্বিতীয় গল্পটিতে যখের চেয়ে যখের দর্শকের কাহিনীই প্রধান। তাঁহার বংশ পরিচয়, চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ইত্যাদি আলোচনায় প্রায় একপৃষ্ঠা কাটাইয়া পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় আসল গল্পের অবতারণা। আসল গল্পটি এই যে তিনি নদীর জলে পাঁচটি তামার ঘড়ায় যখ বালককে বসিয়া গান করিতে করিতে ভাসিয়া চলিতে দেখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে দর্শক একঘটি সিদ্ধি খাইয়াছিলেন সে কথাও আছে। পরিশেষে চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন "এ গল্প যেমন শুনেছি তেমনি লিখছি।"

—

না লিখিলেই কি চলিত না? একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে অবশ্য বৃদ্ধেরা শিশু হইতে থাকে; অনেকে হামাগুড়ি পর্য্যন্ত দেয়। এসম্বন্ধে আর এক রমা ঠাকুর গাঁজা খাইয়া যে গল্পটি করিয়াছিল সেটা আর বলিলাম না। সে এক বৃদ্ধকে হামাগুড়ি দিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। গল্পটিতে "আর যাহাই থাক বিদঘুটে ভয় নাই।" চৌধুরী মহাশয়ের রমা ঠাকুর সিদ্ধি খাইয়া একটু বেচাল হইয়া পড়িয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি চৌধুরী মহাশয়কে বলিতেছেন—"তুমি দুদিনেই ভাল হ'য়ে উঠবে।......নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন? ...... তা জানবেন কি ক'রে?"

—

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অন্যান্য দিন চোখ বুজিয়া পথ

চলিয়াছেন—সেই জন্য, তাঁহার জীবন-আলো যে short focus হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু

এ দিনের পথ দিয়ে আসিতে দুধারে
দু চোখে চেয়েছি বারে বারে।
জীবন আলোকে নেই নিঃসীমার দূর
রহস্যে মন্ত্রিত (?) বাজে কাছাকাছি সুর ;

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আলো প্রায় সর্ব্বদাই টুং টাং করিয়া বাজিতে থাকে। সুর কখনো তফাৎ তফাৎ, কখনো কাছাকাছি বাজে। দুইটির কোনো-টাই ত ফেলনা নয়। সেই আলোর বাজনা এবারে হাতের কাছেই বাজিতেছে। ব্যাটারি বদলাইয়া দেখিতে পারেন focusএর দৈর্ঘ্য বাড়ে কিনা।

—

যাহা হউক সেই কাছাকাছি সুরের আলোতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন মুগ্ধ হইল, তাঁহার সাধ হইল চারিদিকে কি আছে একবার দেখিয়া লইতে। দেখা গেল, কুমড়ালতার ফুল খড়ের চালের উপর নামিয়া আসিয়া মাটির প্রণামী ধরিয়াছে—এবং

সম্ভাবনার শেষ মেঠো পথ পাশে
কচুপাতা হোলো অনায়াসে।

কিসের সম্ভাবনা? কাব্য-কর্ম্মের সম্ভাবনা বলিয়াই মনে হইতেছে, কেননা অর্থ-সঙ্গতি নষ্ট হইয়া গেলেও প্রথম আট ছত্র পর্য্যন্ত ছন্দ-সঙ্গতি বজায় ছিল। ইহার পরেই গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। ছন্দের সম্ভাবনা শেষ হইয়াছে ষোড়শ ছত্রে। অর্থও কচুপাতাতে নিবদ্ধ!

একটু আগে হইতে পড়া যাউক—

স্বচ্ছ দিঘি জলে
গতিমগ্ন (?) বোবামাছ প্রাণের নিগূঢ় সুখে ঝলে।
তটপ্রান্তে সঙ্কলিত তেঁতুল তরুর কাঁপে ছায়া
রেখায় আলোকে রচে সূক্ষ্ম কায়া,
চারু চিত্রজালে তার—

—

প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় বিচিত্রায় যে বিস্ময় দেখাইয়াছেন তাহাতে বৈজ্ঞানিক বিস্ময় কিছু আছে। ফোটোগ্রাফিক ডার্করুমে যে সমস্ত কেমিক্যাল থাকে তাহাকে "ঔষধ"ও বলেনা "অ্যাসিড"ও বলে না। রোগী সুস্থ হইবার জন্য যাহা ব্যবহার করে তাহার নাম ঔষধ, তাহা ডার্করুমে থাকিবার কথা নহে। "নানা ঔষধ ও অ্যাসিড" বলিলে অ্যাসিড যে ঔষধ নহে তাহাই প্রমাণ হয়—অথচ বহু অসুখে অ্যাসিড ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেমিক্যালকে যদি ভুল করিয়া ঔষধ বলা হইয়া থাকে তবে সে ঔষধের তালিকায় অ্যাসিড পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয় কেন?—পরবর্ত্তী বিস্ময়, লেন্সের উপাদান-ঘটিত অভিমতে। ক্যামেরার লেন্স নাকি পাথুরে লেন্স! অর্থাৎ কাঁচের নয়! রসায়ন শাস্ত্র এবং ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে অন্তরে এরূপ উদারতা পোষণ করিয়া নায়ককে ফোটোগ্রাফার না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

—

H. G. Wells "The Sleeper Awakes" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।—কিন্তু "The Sleeper Does Not Awake" নামক উহার পাল্টা আর একখানি গ্রন্থ তিনি এখনও লিখিতে পারেন,

এই গ্রন্থের প্রেরণা বিচিত্রা দিবেন। কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীমতী শান্তি ঘোষ বি-এ রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

> বস্তুত আজকের এই বাঙ্গলাদেশ সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই সৃষ্টি। তাই মনে হয় সেই আঁধারে (তাঁহার জন্মসময়ের সামাজিক কুসংস্কার অজ্ঞতা প্রভৃতির আঁধারে)—রামমোহনের জন্ম যেমন অসম্ভব তেমনি অবশ্যম্ভাবী !

অর্থাৎ তাঁহার জন্ম হয় নাই, এবং নিশ্চয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বলিতে অবশ্যই বাংলাদেশের ভূগোল বুঝায় না, সমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সবই বুঝায়। বাঙালী-সমাজে জাতিভেদ আছে, ইহা রামমোহনের সৃষ্টি। শিক্ষার জন্য দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি বিশ্বভারতী ইহা রামমোহনের সৃষ্টি। বাঙালী যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় ইহা রামমোহনের সৃষ্টি। মাড়োয়ারী ভাটিয়া এবং অন্যান্য অবাঙালী বাংলাদেশ শোষণ করিতেছে ইহা রামমোহনের সৃষ্টি। প্রায় ঘরে ঘরে প্রতিমাপূজা হয় ইহা রাম-মোহনের সৃষ্টি। কারণ সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান বাংলার তিনিই জনক।

—

বিচিত্রা-সম্পাদক যে এখনও ঘুমাইতেছেন তাহার প্রমাণ—

> ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সে যুগে ইহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার !

Tagore had given his explanation at the start instead of at the close of the performance, he would, I am quite sure, have benefited the whole audience......Dr. Tagore's decision to omit the item at to-night's performance was most unexpected, as one would look for more tolerance of petty annoyances from a poet-philosopher of his type. It resembles the act of a temperamental artist who destroys his work merely because it had met with some adverse criticism."

—

মনে পড়িতেছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে "ঋতু উৎসব" অভিনয়ে বাঙালী দর্শক হাততালি দিয়াছিল। মাদ্রাজীদের মত ঠাট্টা করিয়া নহে, ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া। ভাল লাগিলে হাততালি দেওয়া সর্ব্বত্র চলে না, ইহা বাঙালী দর্শক জানে না। অনেক সূক্ষ্ম কারু-সম্বলিত আবৃত্তি, নৃত্যছন্দ, অভিনয় বা গান বাঙালীরা চটাপট হাততালি দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। নীরবেও যে উপভোগ করা যায় এ শিক্ষা তাহার হয় নাই। সে তাহার সেই অল্পশিক্ষাপ্রসূত চীৎকারমূলক অভিনন্দন দ্বারা সেদিন অভিনয়ের রসভঙ্গ করিয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি সেদিন বাঙালী দর্শককে ক্ষমা করেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ষ্টেজে দাঁড়াইয়া হাততালির বিরুদ্ধে উত্তেজিত ভাবে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

—

রবীন্দ্রনাথের সহনক্ষমতা যে একেবারেই নাই, অতি সামান্য

কারণে তিনি যে এত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন ইহা নিতান্তই আকস্মিক নহে। বরঞ্চ ইহা যে নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাদ্র সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে "খ্যাতির পিপাসা" নামক প্রবন্ধে ইহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। কবি নিন্দাও যেরূপ সহ্য করিতে পারেন না, লোকের প্রশংসাও তেমনি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন না। এই শাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবে কে?

—

বিচিত্রায় দুই তরুণ কবিকে প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় একেবারে স্তম্ভের মত পাশাপাশি খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহারাই বর্ত্তমানে সম্পাদকীয় স্তম্ভ! দেখিয়া আমরাও স্তম্ভিত হইলাম।

প্রথমটি বলিতেছেন—

ওরে মন, তারি লাগি অহর্নিশ কেন বৃথা শোক?
এখনো অন্তর তোর পেতে দিস আলুল আদুর
তাহার চরণ লাগি!

আলুল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আদুর কি? বাদুড়ও নিজের নাম সম্বন্ধে এরূপ অসতর্ক নয়। কিন্তু "আদুর" যাহাই হউক কবির উদ্দেশ্য কি? "সে জন মিটায় আজি পুরুষের কামনা মলিন, নিজেরে নিঃশেষ করি"—বর্ত্তমানে যে জনের এরূপ অবস্থা সে জন সম্বন্ধে কল্পনা করিতেই কবি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিচিত্রা অন্যত্র যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাহার সার্থকতা বুঝিতেছি! কিন্তু কবির ষড়্‌রিপু দমিত থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, যে নিজেকে নিঃশেষ করিতেছে, তাহাকে শেষকালে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াই কাপুরুষতা।

তাহার জন্য যদি অহর্নিশ ব্যথা জাগে তাহা হইলে ব্যথিতকে প্রশংসাই করিতে হইবে, বলিতে হইবে ছেলের মরাল কারেজ আছে। "তবু তুই আসঙ্গ বিভোর!"—এ প্রশ্ন কেন? কবি কি তখন গীতা পড়িবেন?

—

'কেন'র কবি স্পষ্টতন্ত্রী। "জানিতে চাহিছ প্রিয়া কেন ভালবাসি?" এ প্রশ্নের সরল উত্তর তিনি দিয়াছেন—

যাহা হেরি মুগ্ধ আমি—সে ত নহে কভু
পূর্ণশশী ম্লান-করা ঐ মধু মুখ·········
* * যে গন্ধ লুকায়ে ছিল আমার কোরকে
পেয়েছি আভাস তার তোমার আঘ্রাণে।

এবং vice versa.—কিন্তু এরূপ আঘ্রাণের প্রবৃত্তিকে প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

—

বিসর্জ্জনের কবি বলিতেছেন—

যেই চির বঞ্চিতের কাঙাল হৃদয়
চাহে পথ সারাটি বরষ
শঙ্কাহরা শঙ্করীর লভিবে দরশ,
আশা তার
মিটে কই আর?

জনৈক তরুণ কিছুকাল পথ-চল্‌তি রিক্‌শগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই ধরণের একটি কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আশা মিটে নাই।

"নাগরিক" নামক সাপ্তাহিকে শ্রীমতী বেলা "আমার যৌবনের কয়েকটি দিন" নামক রচনায় তাঁহার প্রেমপ্রার্থীদিগের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার সে দিনগুলি এখন অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে কয়েকটা কথা বলি। তিনি অতিথিদের সম্বন্ধে অনেক জায়গাতেই একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদের স্বজাতীয় নিষ্ঠা এবং রীতিনীতি সেকালে অন্য প্রকার ছিল। সেকালে অতিথি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ দূরের কথা—কি করিয়া তাঁহাদিগকে কামনা করিবে, কি উপায়ে তাঁহাদিগকে কায়মনোবাক্যে সেবা করিবে ইহাই ছিল বারবধূদের শিক্ষনীয় বিষয়।

—

বৈষ্ণবীয় শাক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া আমাদিগকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা বিবৃত করিতেছি। শ্রীমতী বেলা যখন রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন আশা করি তিনি স্বজাতীয়ের মধ্যে পৌরাণিক বিধি বিধান এবং ব্রত আচারগুলি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে কলঙ্কমুক্ত করিবেন।

—

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন—

পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে অনঙ্গদান নামক একটি ব্রতের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে শত শত দৈত্য দানব অসুর রাক্ষস বিনষ্ট হইলে, তাহাদের শত সহস্র রমণী বলপূর্ব্বক ভুক্ত এবং পরিণীত হইয়াছিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা

রাজভবনে বেশ্যাধর্ম্মে এবং দেবকুলে ভক্তিমতী হইয়া অবস্থিতি পূর্ব্বক রাজার ও স্বামীর নিকট হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইবে। যে কেহ শুল্ক লইয়া তোমাদের গৃহে আসিবে, প্রীতিপূর্ব্বক তাহারই সেবা করিবে। দেব ও পিতৃগণের পুণ্যাহ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি গো, ভূমি, হিরণ্য ও ধান্যাদি দান করিবে"। অতঃপর দেবরাজ তাহাদিগকে একটি ব্রতের কথা বলেন,—এই ব্রতই "অনঙ্গ দান"।

—

"রবিবারে হস্তা, পুষ্যা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র পাইলে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিতে হইবে। ঐ যোগে পঞ্চ শরাত্মক হরি সন্নিহিত হন, স্নানান্তে অনঙ্গ দেবের নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার পাদযুগলে কামকে, জঙ্ঘায় মোহকারীকে, মেঢ্রে কন্দর্পনিধিকে, কটিতে প্রীতিমানকে, নাভিতে সৌখ্য সমুদ্রকে, উদরে বামনকে, হৃদয়ে হৃদয়েশকে, স্তনযুগ্মে আহ্লাদকারীকে, কণ্ঠে উৎকণ্ঠকে, মুখে আনন্দকারীকে, বাম স্কন্ধে পুষ্পচাপকে, দক্ষিণ স্কন্ধে পুষ্পবাণকে, ললাটে মানসকে, মূর্দ্ধজে বিলোলকে এবং মস্তকে সর্ব্বাত্মাকে 'নম' এই শব্দ যোগে পূজা করিতে হয়। স্তব করিবে, যথা—

নমঃ শিবায় শান্তায় পাশাঙ্কুশধরায় চ।
গদিনে পীতবস্ত্রায় শঙ্খ চক্র করায় চ॥
নমো নারায়ণায়েতি কামদেবাত্মনে নমঃ!
নমঃ শান্তৈ নমঃ প্রীত্যৈঃ নমো রত্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈঃ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ সর্ব্বার্থ সম্পদে॥

—

এইরূপে অনঙ্গাত্মক গোবিন্দকে গন্ধ মাল্য ধূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা

পূজা করিয়া একজন অবিকলাঙ্গ বেদপারগ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিবে এবং তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক মাধবের প্রীত্যর্থ মৃৎপাত্রযুক্ত শালি তণ্ডুলপ্রস্থ দান করিতে হইবে। পরে যথেষ্টরূপে ভোজন করাইয়া রতির নিমিত্ত সেই অনুপম বিপ্রকে মনে মনে কামদেবরূপে চিন্তা করিবে। সেই বিপ্র যেমন যেমন ইচ্ছা করিবেন, স্মিতভাষিণী বিলাসিনীকে সেইরূপ আচরণপূর্ব্বক সর্ব্বভাবেই তাঁহার নিকট আত্মদান করিতে হইবে। প্রতি রবিবারে এইরূপ আচরণে ত্রয়োদশ মাস তণ্ডুলপ্রস্থ দান কর্ত্তব্য। ত্রয়োদশ মাসে ব্রতকারিণী উক্ত বিপ্রকে উপস্কর, উপাধান, বিন্যাস, আস্তরণ, দীপিকা, উপানহ্, ছত্র, পাদুকা ও আসনযুক্ত শয্যাদানপূর্ব্বক, গুড়কুম্ভোপরিস্থিত, তাম্রপাত্রাসনগত, পটাবৃত হেমনেত্র, হেমসূত্র, অঙ্গুরীয়ক, সূক্ষ্ম বস্ত্র, ঝটক, ধূপ, মাল্য ও অনুলেপনাক্ত সপত্নীক কামদেব, একটি পয়স্বিনী গাভী এবং কাংস্যপত্র ও ইক্ষুদণ্ড তাঁহাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দান করিবে। মন্ত্র—

যথান্তরং ন পশ্যামি কামকেশবয়োঃ সদা।
তথৈব সর্ব্বকামাপ্তিরস্তু বিপ্র সদা মম॥

ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া রতি কামের কাঞ্চন প্রতিমা সহ সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক "কো অদাৎ" এই প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। বিপ্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিয়া উৎসর্গ করা দ্রব্যগুলি তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিবে।

তাহার পরও যদি রবিবার কোন ব্রাহ্মণ গৃহে আসেন, তাঁহাকে স-সম্মানে পূজা করিয়া তৃপ্তিদান পূর্ব্বক বিদায় দিবে। আরো ত্রয়োদশমাস এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। অন্য যে কেহ

কামার্থী হইয়া গৃহে আসিবে, (শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক) তাহাদিগকেও অনুজ্ঞা দান করিবে।

শয্যয়া ত্যজ্যতে দেব ন কদাচিৎ যথা ভবান্। শয্যা মমাপ্য-শূন্যেয়ং তথাস্তু মধুসূদন॥" এই প্রার্থনায় দেবদেবের নিকট গীত বাদিত্র নির্ঘোষ কর্ত্তব্য।"

যদুবংশ ধ্বংসের পর দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা যাদবরমণীগণের নিকট দালভ্য ঋষি ইন্দ্র কথিত এই ব্রতের বর্ণনা করিয়াছিলেন। কোনরূপ তুলনা না করিয়া অন্য একটা ব্রতের উল্লেখ করিতেছি। বেশ্যাগণের করণীয় অনঙ্গদান ব্রতের মত গৃহীর করণীয় প্রায় অনুরূপ একটি ব্রত পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের ২৪ অধ্যায়ে পাইতেছি,—নাম "অশূন্য শয়ন।" এ ব্রতের প্রার্থনামাত্র—গৃহী প্রার্থনা করিবে—

লক্ষ্ম্যাব বিযুজ্যতে দেবো ন কদাচিৎ যথা হরি।
তথা ম্যাত্রে সম্বন্ধো দেব মে মা বিযুজ্যতাম্॥
লক্ষ্ম্যা ন শূন্যং বরদ যথা তে শয়নং সদা।
শয্যা মমাপ্য শূন্যাস্তু তথৈব মধুসূদন॥

ইহাতেও সন্তানশালী দ্বিজ দম্পতীকে অর্চ্চনা ও নানা উপহার দানের কথা আছে। গৃহী সস্ত্রীক এই ব্রত আচরণ করিবে। অবশ্য প্রধান পার্থক্য—বেশ্যা ধর্ম্মে ও গৃহস্থ ধর্ম্মে, সুতরাং তুলনা চলেনা। মাত্র অনুষ্ঠানে এ প্রার্থনা মন্ত্রাদিতে একটা সাদৃশ্যের জন্য এখানে উল্লেখ করিলাম।

ইন্দ্র বলিয়াছেন—'বেশ্যা ধর্ম্মে নৃপমন্দিরে এবং ভক্তিমতি হইয়া দেবকুলে;'—এই দেবকুল কথায় দেবমন্দিরের দেবদাসীকেই বুঝাইয়েছে

কি? পুরাণে পাঠ আছে রাজ্ঞতঃ স্বামিনশ্চাপি”—রাজা এবং স্বামীর নিকট।—এই স্বামী কি দেবমন্দির স্বামী, না পরিণীত স্বামী? পূর্ব্বে “পরিণীতানি যানিস্ম্যর্বলাভূমানি যানি বৈ” শ্লোক হইতে পরিণয়ের কথা আছে। তবে কি দেবদাসীরা প্রথম এই জাতীয়া পতিহীনা ও দ্বিতীয়বার পরিণীতা রমণী ছিল? পরে কুমারী দেবদাসী রাখিবার প্রথা আসিয়াছে? কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর নিকটেও তো শুল্ক দিয়া যে কোন ব্যক্তির যাওয়ার কথা রহিয়াছে! পরিণীতা,—স্বামী আছে, আবার এ-কি? একথা আমাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আশা করি কোন পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ইহার রহস্যোদ্ভেদ করিবেন।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের বর্ত্তমান সংস্করণ কত দিনের পুরান জানিনা। বাৎস্যায়নের ‘কামসূত্র’ নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা আরো পুরাতন, ‘কামসূত্রে’ এইরূপ কোন ব্রতের উল্লেখ পাই না। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—“রাগো ভয়মর্থঃ সংঘর্ষো বৈর নির্য্যাতনং জিজ্ঞাসা পক্ষঃ খেদো ধর্ম্মো যশোঽনুকম্পা সুহৃদ্বাক্যং হ্রীঃ প্রিয় সাদৃশ্যং ধন্যতা রাগপনয়ঃ সাজাত্যং সাহ বেশ্যং সাতত্য মায়তিশ্চ গমনকারণানি ভবন্তীত্যাপর্য্যাঃ।—(বৈসিকাধিকরণ ১ম অধ্যায়) যশোধর জয় মঙ্গল টীকায় “ধর্ম্ম” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন “কোন অকিঞ্চণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে তাঁহাকে তৃপ্তিদান।” “যশ”—কোন এক তিথিতে কামসত্র প্রদান। এই অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তমাগণিকার লাভাতিশয় প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে দেবকুল তড়াগারামাণাং করণম, স্থলীনা মগ্নিচৈত্যানাং নিবন্ধনম,

গোসহস্রাণাং পাত্রান্তরিত ব্রাহ্মণেভ্যো দানম্, দেবতানাং পূজোপহার প্রবর্ত্তনম্, তদ্ব্যয় সহিষ্ণোর্বা ধনস্য পরিগ্রহণম ইত্যুত্তম গণিকাণাং লাভাতিশয়ঃ॥ বাৎস্যায়ন দেখিতেছি "দেবকুল" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। যে নায়ক গণিকার কথামত দেবকুল, তড়াগ, আরাম, সেতু, পান্থশালা, দেবতার পূজোপহার ইত্যাদির ব্যয় বহন করিবে, উত্তমাগণিকা তাহাকেই আশ্রয় করিবে। এ দিকে গোদানের বেলায় পাত্রান্তরিত করিয়া—অন্য লোকের হাত দিয়া ব্রাহ্মণকে দিতে বলিতেছেন; আবার দেবতার পূজোপহারের কথাও আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে এ সমস্তও গণিকা নিজ হস্তে উৎসর্গ করিত না।, অথবা বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল। বাৎস্যায়ন একটু সংস্কার করিয়াছেন। যাই হৌক এই সমস্ত অলোচনা করিয়া অনঙ্গদান ব্রতের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে সন্তুষ্ট করিবে এবং বিশেষ তিথিতে কামসত্র দিবে, বাৎস্যায়নের এই দুইটী উক্তি মিলাইয়া বোধহয় পরবর্ত্তীকালে অনঙ্গদান ব্রতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আমাদের মনে হয় বৌদ্ধ প্রাধান্যের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় এই ব্রতের উদ্ভব হইয়াছিল। আরো অর্ব্বাচীনকালেও হইতে পারে। পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের বর্ত্তমান সংস্করণ কোথাও রচিত এবং কোন সময় প্রচারিত হইয়াছিল ?

—

জীবন-সংগ্রামে কাজী নজরুল ইস্লাম যে আরো এক পয়েন্ট জিতিলেন, তাহার প্রমাণ পাইলাম্ "মায়ের অনুগ্রহে"। আমরা কিছু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, বাংলা বর্ণমালার বিন্দু এবং বিসর্গ বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। বাকী ছিল অনুস্বার। কাজি

সাহেব প্রমাণ করিলেন, এই অনুস্বারই ধাপে ধাপে মানুষকে উচ্চে-তুলিয়া বিন্দুবিসর্গে পৌছাইয়া দেয়। "নাগরিক" কাগজে তিনি বলিতেছেন—

হিমালয় মা'র বাবার আলয় শুভ্র অভ্র-লিংহ্
মায়ের বাহন ভুবন-মথন পাশব শক্তি-সিংহ্।

কাজী বাঙাল নহেন, তিনি সিঙ্গী লেখেন নাই—লিখিলে কি কাণ্ডটাই না হইত! "অভ্র-লিংহ্" "সিঙ্গীর" সঙ্গে মেলানো যায় না তাই এ যাত্রা আমরা রক্ষা পাইলাম। কিন্তু আমাদের গণনা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে আগামী পূজার পূর্ব্বে অভ্র-লিংহ্ অভ্র-লিহং হইতে বাধ্য।

—

আমাদের গণনা যে নির্ভুল হয় তাহার প্রমাণ দিতেছি। উপাধি হিসাবে 'দাস' ক্রমশ 'দাশ' হইতেছে দেখিয়া আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম—"এইবার মূর্দ্ধন্য ষ-এর পালা।" মূর্দ্ধন্য ষ দেখা দিয়াছে! "মা ও জাতি" নামক পুস্তিকার লেখক শ্রীসুকুমাররঞ্জন "দাষ"! দাসত্ব-প্রথা লোপ করিবার এই সহজ কৌশলটি যদি আমেরিকা জানিত তাহা হইলে সেখানকার slaveগণও এক মুহূর্ত্তেই Slav হইয়া যাইত। আমাদের দাসত্বপ্রথা নাই—বানানপ্রথা আছে, কিন্তু তাহা গেল।

—

খুব ভালই হইল। আমরা নিম্নলিখিত মতে আরো কয়েকটি উপাধি পরিবর্ত্তনের পক্ষে ভোট দিতেছি।

শ্রীহলধর হাতী	লিখিবেন	শ্রীহলধর ময়ূর।
শ্রীরমাপতি দত্ত	"	শ্রীরমাপতি দাতা।
শ্রীবীরেন বল	"	শ্রীবীরেন ব্যাট।

শ্রীকেশব কর লিখিবেন শ্রীকেশব করব না।
শ্রীদেবেন দে " শ্রীদেবেন তুই দে।

Axioms-এর মত দিলীপকুমারের কবিতা বিনা প্রশ্নে মানিয়া লইতে হইবে। Axiom-এর নিজের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা নাই, অন্যকে প্রমাণিত করিবে বলিয়াই তাহার জন্ম; দিলীপকুমারেব কবিতাও তেমনি অন্যকে প্রেরণা দিতে আসিয়াছে,—নিজে প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া আসে নাই। উহা যিনিই পড়িবেন তিনিই কবিতা লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন। বোধ হয় বাংলাদেশে হঠাৎ কবির সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবার মূলে দিলীপকুমার। কবিতা লিখিবার পক্ষে প্রধান বাধা প্রেরণার অভাব, চক্ষুলজ্জা এবং ভাষা। দিলীপকুমার দেখাইলেন, ইহার কোনোটাই জরুরী নয়।

চুম্বন, ক্ষমি' শূন্যতা জন্মাষ্টমী পুণ্যদা
লজ্জিল মরণ পুরে।

এতদ্দ্বারা দিলীপকুমার বাঙালীর ভীরুতাও ঘুচাইয়াছেন। ট্র্যান্‌স্লেশন লিখিবার জন্য ভাল বাংলা বই বাজারে পাওয়া যায় না বলিয়াই তাঁহার এই কর্ম্ম। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে ট্র্যানস্লেশন শিখাইতেছেন। বিশ্বাস না হয় কার্ত্তিকের ভারতবর্ষ খুলিয়া দেখিতে পারেন। মনে হইতেছে শ্রীঅরবিন্দকে রাঁচি পৌঁছাইয়া দিয়া দিলীপকুমার দেশে ফিরিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

—

অচিন্ত্যকুমারের "একরাত্রের অতিথি" এবং প্রবোধকুমারের "বিস্ময়" একই বিজ্ঞানকলেজের দুইটি ল্যাবরেটরি হইতে উদ্ভূত।

'অতিথি' প্রধানত ফিজিক্সের এবং 'বিস্ময়' কেমিষ্ট্রির। বিস্ময়ের কেমিষ্ট্রি কিছু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—এইবার 'অতিথি'র ফিজিক্স দেখুন।

> আমাব পায়ের দিকে কেমন একটা 'ঠাণ্ডা' ভয় করতে লাগলো। নামহীন, নিরবয়ব ভয়। (Heat)
>
> সহায়রাম নির্লিপ্ততায় 'ধূসর' হয়ে এল। (Light)

অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রিও আছে—

> আমার পায়ের কাছে একতাল "মাংস" ঠেকলো, শক্ত ঠাণ্ডা স্তূপীকৃত একতাল মানুষের মাংস।

তদুপরি দুইটি গল্পের শেষেই পুলিসের আবির্ভাব এবং দুইটি গল্পের নায়কই খুনী আসামী।

—

"ভারতবর্ষ" তরঙ্গায়িত ছন্দের কুহেলিকা যাহা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্বস্ত হইলাম। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আনন্দেই আমাদের আনন্দ। ছন্দের নীবিবন্ধন শিথিল, বক্ষোদেশ উন্মুক্ত। দেবীমূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া খেঁদি, পুঁটি সকলের সম্বন্ধেই চিত্রকরগণ এই একটি পথের খোঁজ পাইয়াছেন। তরঙ্গায়িত ছন্দের স্ত্রীলোক দুইটিকে দেখিয়া লেখকের মুগ্ধ হইবার কারণ বুঝিতেছি। Gluteal প্রদেশ এরূপ অবস্থায় সচরাচর দেখা যায় না। অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীমান চিন্তামণি করের বয়স এখনও খুব অল্প। তাহার কলেজের পাঠ কেবল মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে......।" আমরাও অবাক হইয়া ভাবিতেছি ইহারই মধ্যে!

কিন্তু, অধ্যাপক মহাশয় একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। আমর সেজন্ত তাঁহাকে দোষ দিতেছি না।—অনুভূতি এবং জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। আমার যদি সুখানুভূতি হয় তবে কাহারো পিতার সাধ্য নাই যে তাহার প্রতিবাদ করে অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনস্বীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত কে হইবেন ইহা লইয়া আর ভাবিতে হইবে না। যাঁহারা হইবেন, চিন্তামণি কর তাঁহাদের অন্যতম। আমরাও অসম্ভব মনে করি না। অ্যানিবেসাণ্ট কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছিলেন, আমরা অবিশ্বাস করি নাই। কিন্তু মহাদেবরূপী নারী-ধর্ষণকারী কিংবা ছন্দের কুহেলিকা জাতীয় চিত্র দেখিয়া চিত্তে মাঝে মাঝে অবসাদ আসে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় সংখ্যা] পৌষ, ১৩৪১ [৭ম বর্ষ

ভারতচন্দ্র

মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্র-অঙ্কনে; অবশ্য কল্পনায় নয়, তার কারণ কল্পনাশক্তি মূলেই তাঁহার ছিল না। সাহিত্যে যে urbanity আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রে তাহা পাই; মুকুন্দরাম sub-urbanityতেও পৌঁছিতে পারেন নাই। একদল আছেন যাঁহারা বলেন মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, তিনি তৎকালীন লৌকিক ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সাহিত্যের নহে। সাহিত্যের ভাষার আদর্শ লৌকিক নহে, অলৌকিক। অর্থাৎ যে ভাষায় লোকে কথা বলে তাহা নয়, যে ভাষায় লোকের কথা বলা উচিত তাহাই। যেমন কাব্যের ঘটনা কাব্য নহে, তাহার উপাদান মাত্র; ঘটনা ভাবনায় রূপান্তরিত হইলেই কাব্য-সৃষ্টি হয়। তেমনি মুখের

ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদান মাত্র, তাহা "আদর্শায়িত" হইয়া উঠিয়াই কাব্যের ভাষায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের ভাষায় এই আদর্শীকরণ নাই।

মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি চরিত্র ব্যতীত সবই অপসৃষ্টি। তাহা মূলে যে চরিত্র-সৃষ্টির উপাদান মাত্র ছিল ফলেও সেই উপাদান রহিয়া গিয়াছে। এই সব সৃষ্ট-চরিত্র একান্তভাবে লৌকিক ও গ্রাম্য হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তবেই সেই সব চরিত্র-চিত্রের খানিকটা মর্ম্ম-উদ্ঘাটন সম্ভব।

একমাত্র ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব-চেয়ে গ্রাম্য ব্যক্তিটি সাহিত্যিক গ্রাম্যতা-দোষের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব কতটা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মুকুন্দরাম কাব্যের যে উপাদান হাতের কাছে পাইয়াছিলেন তাহাই গুছাইয়া কাব্য আকারে সাজাইয়াছেন, যে দিব্য কল্পনাশক্তি উপাদানকে কাব্য করিয়া তোলে তাহার অভাববশত মুকুন্দরাম উপাদানের উপরে নিজের প্রতিভার ছাপ তেমন করিয়া দিতে পারেন নাই। ইহা সত্য হইলে, ভাঁড়ুদত্তের সৃষ্টির খ্যাতিতে মুকুন্দরামের দাবী অনেকটা কমিয়া যায়। আমার বিশ্বাস ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি কবি কল্পনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্বে পাইয়াছেন ও চারি পার্শ্বে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হইলে, আশা করি তখন আমাদের মন্তব্যের মূল্য উপলব্ধি হইবে।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই জনেরই বৈশিষ্ট্য দুইটি অপ্রধান চরিত্র-

কল্পনায়, হীরামালিনী ও ভাঁড়ুদত্তের। একটি পূর্ণ সৃষ্টি ও একটি অপূর্ণ সৃষ্টিতে কি প্রভেদ বোঝা যায় এই দুটি চরিত্রের সমালোচনায়। এমন অসম্ভব নয় যে ভারতচন্দ্র হীরার চরিত্রের উপাদান পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা যাহা পাই তাহা অসম্পূর্ণ উপাদান নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টি। ভাঁড়ুদত্ত ও হীরামালিনী দুজনেই সাহিত্যিক urbanityতে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বুঝিবার জন্য পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন সমাজে প্রবেশ করিতে হয় না।

হীরার চরিত্র কেবল মাত্র একটি অস্পষ্ট outlineএ অঙ্কিত নহে, ছোটখাটো ঘটনায়, কথাবার্ত্তায়, রসালাপে, তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের detailএ তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ স্পষ্ট জীবন্ত। ভাঁড়ুদত্ত একটিমাত্র outlineএর সৃষ্টি। যে কল্পনা-শক্তি, ভাষাকে আদর্শায়িত করিবার শক্তি থাকিলে, নানরূপ detailএর দ্বারা, পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করে, তাহার অভাববশত এই outlineএর সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের এই অবকাশপথে পাঠকের মনোযোগের ও রসবোধের অনেকটা অংশ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়। মুকুন্দরাম যে বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) পন্থার কবি, তাহার পক্ষে তথ্যের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সে তথ্যের সমাবেশ যেখানে অনাবশ্যক সেখানে তিনি করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাহা অবশ্যম্ভাবী সেখানে কবির খেয়াল নাই। ইহার একটি কারণ আছে মনে হয়, কবি বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ ভাঁড়টাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি প্রভৃতি বড় বড় বীর ও প্রধান চরিত্রকে বাদ দিয়া ভবিষ্যতের পাঠক ঐ গ্রাম্য মোড়লটার প্রতি এত একাত্মকতা (sympathy) অনুভব করিবে। আমার তো মনে হয় না বুঝিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। অনিপুণ কবির দৃষ্টি এদিকে পড়িলে

তাহাকে দ্বিতীয় একটা কালকেতু করিয়া তুলিতেন। পিতৃ-পরিত্যক্ত কর্ডেলিয়া যেমন লিয়ারের বিপদে সহায় হইয়াছিল, কবির এই ত্যজ্য পুত্রও তেমনি মুকুন্দরামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে-সমাজে কবি সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহা ছিল গ্রাম্য; সে সমাজ আনন্দ পাইত কালকেতুর মত বিকট একটা বিদূষক-বীরের কল্পনায়। তাহা আসরের প্রান্তবর্ত্তী ভাঁড়ুকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। ভাঁড়ুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িলে শনিদৃষ্টি-ভস্ম-গণেশ-মস্তকের ন্যায় ভাঁড়ুরও দুর্দ্দশার একশেষ হইত। কাব্য যে কবির একার সৃষ্টি নয়, সমাজ যে তাহাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে কাল-কেতুর বিকৃতি ও ভাঁড়ুর নিষ্কৃতিতে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের মত ভারতচন্দ্রও পাঠক-নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার আদর্শ রুচি ও ফরমাইস খানিকটা পরিমাণে তাঁহার লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকুমারী বিদ্যার প্রতি স্বভাবতই রাজার লক্ষ্য ছিল, কাজেই বিদ্যাকে বাক্য ও বাহ্য অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে কবি বাধ্য হইয়াছেন। রাজ-কুমার সুন্দরের প্রতিও রাজার দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই তাহাকেও রাজাদর্শোচিত করিয়া গড়িতে হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও নায়িকা, সৌন্দর্য্য ও বিদ্যা; রাজসভার আদর্শ ইহার অপেক্ষা আর কি বেশি হইতে পারে! যে সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা ভারতচন্দ্রে পাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার চর্চ্চাই হইত, গভীরতার অপেক্ষা নিপুণতা যাহাতে অধিক, আন্তরিকতার অপেক্ষা বাহ্যিকতা যাহাতে অধিক। এই সব দেখিয়া এক একবার মনে হয় কবি

গল্পের উপলক্ষ্যে রাজসভার রূপক লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপক একাধারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রূপকথা এবং স্বরূপ কথা।

কিন্তু কবি এক স্থানে স্বাধীন ছিলেন, অপ্রধান চরিত্রের মহলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হীরামালিনী। এখানে কবির প্রতিভা অপ্রতিহত ভাবে লীলা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার ফল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত নারী-চরিত্র। হীরা ভাঁড়ু দত্ত দুজনেই জীবিত, বাংলা দেশের পথে ঘাটে আজো তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময় ভাবিয়াছি, যদি পথের মোড়ে হীরার সহিত ভাঁড়ুর দেখা হয়, তবে কেমন হয়। যাহাই হোক, হীরার তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত ব্যঙ্গবাণে দুর্দ্ধর্ষ ভাঁড়ুকে যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জ্জিত, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা, প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা বর্ত্তমান সাহিত্যেও বিরল। আজ যে ভাষায় বাংলা কাব্য লিখিত হয়, তাহার পূর্ব্বধ্বনি পাই ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে একশত বৎসরের অব্যবহারে তাঁহার ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাতেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু রায় গুণাকরের তুলনায় তাহা নিতান্ত গ্রাম্য। তীক্ষ্ণ বাণে ও সম্মার্জ্জনীতে (উপযুক্ত হাতে দুই-ই জ্বালাকর) যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়। ভারতচন্দ্রের ভাষার urbanity ঈশ্বর গুপ্তে নাই। এই urbanity আধুনিক যুগে প্রথম বারের জন্য পাই মধুসূদনের রচনায়।

ভাষার এই পরিণতির তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষার স্বাভাবিক পরিণাম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্র যে-ভাষায় কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের ভাষা নহে। এখনকার দিনে যেমন কলিকাতা ও

তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান, তখনকার কালে যেমনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকতা। সৌভাগ্য-ক্রমে বাংলার urban অঞ্চলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কাব্য রচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই জন্যে যে এমনটি হইবার কথা নহে। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের লোক, ঘটনাচক্র তাঁহাকে নবদ্বীপে টানিয়া না আনিলে তিনি উন্নততর ঘনরাম চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকিতেন, অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি হইত না। তৃতীয় ও সর্ব্বপ্রধান কারণ কবির স্বকীয় প্রতিভা। যে-প্রতিভার তাপে ভাব, ভাষা একীভূত হইয়া গিয়া দিব্য বাণীমূর্ত্তির সৃষ্টি করে ভারতচন্দ্রের তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেই শক্তির মাহাত্ম্যে তিনি তৎকালীন কাব্য-পিপাসা মিটাইয়াও এমন ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা পরবর্ত্তী কালেও মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধকে নন্দিত করে।

তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ—তাহা মডার্ণ। প্রাচীন বাংলার অন্য কোনো কবি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধেও একই কথা, কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন চলে না; কিন্তু অন্য কোনো কবির ভাষাকে আমরা মডার্ণ বলিতে পারি না।

এ ভাষা যে মডার্ণ তাহার প্রধান প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে ইহার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর গুপ্ত একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের দোষে ও শক্তির অভাবে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ, মার্জ্জিত, স্বল্পাক্ষর গদ্যে ভারতচন্দ্রেরই পদ্যের ভাষার যেন দূর প্রতিধ্বনি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে-যুগ প্রধানত তাহা সৃষ্টির যুগ। সৃষ্টির যুগের পরে সমা-লোচনার যুগ, Satire সমালোচনার সগোত্র, ভারতচন্দ্র প্রধানত

রোমাণ্টিক satirist। কাজেই বাংলা সাহিত্যে যে-যুগটা আসন্ন, যে-যুগের প্রধান লক্ষণ হইবে সমালোচনা, satire, এবং বাংলা দেশের প্রাণধর্ম্ম অনুসারে রোমাণ্টিক satire তাহাতে ভারতচন্দ্রের ভাষার পুনরুত্থান একান্ত ভাবে অবশ্যম্ভাবী। একজন বড় কবি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, কিছুদিন ধরিয়া তাহার অনুবৃত্তি চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ভাষারই অনুবৃত্তি ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে ভারতচন্দ্রের ভাষার যথেষ্ট অনুবৃত্তি হয় নাই। তার পরে ভারতচন্দ্র সামাজিক যে অনিশ্চয়তা ও নাস্তিকতার মধ্যে বাঁচিয়া ছিলেন আমাদের সময়টাও নানা কারণে অনেকটা সেই রকমের। এই অনিশ্চয়তার, অবিশ্বাসের, নাস্তিকতার সাহিত্যিক পরিণাম satire, এবং বাংলা সাহিত্যে ইহার একমাত্র আদর্শ ভারতচন্দ্র। কাজেই প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পরে এই যুগটাতে ভারতচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিদগ্ধ

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দ্দিত শ্রবণ যুগল,
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল।
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে।

'প্রবেশিকা' সীমা রেখা অতিক্রমি' পিতৃ-পুণ্যফলে
'নলেজ'-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে ;
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে
"মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে।"

আমি হায় ক্ষুদ্র নর—অতি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আমার
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি ;
চকিতে ফলিল ফল !—বুক ফাঁক হইল আমার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি !

দেশ-প্রেম, কৃষ-প্রেম, চর্চ্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছি হ'য়ে এক জোট
সহসা মরিল পিতা ! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম !)
পরীক্ষায় ফেল করি পাইলাম নিদারুণ চোট !

ক্রমশঃ বুঝিতে হ'ল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা !
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দ্দিক হ'তে লভি' বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'-ভেলা 'পরে চড়ি পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রম-ক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরোপরে ভাব-গুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি')
দ্বীপবাসী বৃদ্ধ সম তাড়না করিছে বারম্বার।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য্য নাহি বুদ্ধি বল
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল ;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্ব্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল।

"বনফুল"

———

রবীন্দ্রনাথ বনাম হিন্দুস্থানী সঙ্গীত

আমাদের জাতীয় জীবনে যতগুলি ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে যিনি যে বিষয়ে যত উদাসীন অথবা যত বিরুদ্ধবাদী, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করাইবার ব্যর্থ চেষ্টা, অন্যতমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক industrial ageএর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কাহারও অবিদিত নাই, তথাপি পাটের গুদাম হইতে গেঞ্জি ও মোজার কারখানাগুলি সবই যদি তাঁহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয় তবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ মনে করিবেন তাঁহাদের জীবন ব্যর্থ হইল। নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন ব্যাপারটাও সেই হিসাবে একটা tragic success বলিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্গীত-বিদ্যাকে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষনীয় বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আহ্বান করা হইয়াছিল, তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত একটা dead science, উহার চর্চ্চায় সঙ্গীতের কোন উন্নতি অথবা জাতীয় জীবনে কোন উৎকর্ষ সম্ভবপর নহে। তথাপি তাঁহারই দ্বারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করা গিয়াছে বলিতে পারি না, তবে তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়ার সঙ্কল্প সূচিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। যাহাই হউক, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও তাহার সারবত্তা সম্বন্ধে এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশে বলিয়াছেন—"যাহাকে ধ্রুব-পদ্ধতি সঙ্গীত বলে" সে সম্বন্ধে তাঁহার "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ।" তথাপি "প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি

অশ্রদ্ধা না করে” তাঁহার মন্তব্য যাহা সরল ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই—তাঁহার মতে “সঙ্গীত প্রাণধর্ম্মী জিনিষ এবং চতুর্দ্দিকের পরিশ্রমের ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর” এবং “যে যা পেয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু পাবার জন্য অন্তরের দাবী, প্রেরণা—এই দু'টি লক্ষণকে মিলিয়ে” তিনি “সঙ্গীতের তত্ত্বে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা” করেন। “তা যদি হয় তাহ'লে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে, তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।” তানসেনের গান মোগল-সাম্রাজ্যের পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর এবং সামগান বৈদিকযুগের কর্ম্ম ও যজ্ঞের পূর্ণতার প্রকাশ,—ইত্যাদি। অর্থাৎ রীতিনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় তানসেনের সঙ্গীতও একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। এটা ত আর মোগল-বাদশাদের যুগ নয়, কাজেই আকবর সাহের দীর্ঘজীবন কামনা অথবা মোহম্মদ সাহের প্রেয়সীর জন্য তাঁহার মিলনের পিয়াসাবর্ণনা একেবারে নিরর্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই জানেন তিনি নিজেকে classical music সম্বন্ধে যতখানি অজ্ঞ বলিয়া প্রচার করিতে চান, বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। তাঁহার অনেক গানের সুর প্রচলিত হিন্দী গানের সুর অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহুর মধ্যে দুইটি :—“সুন্দর নাগরী হ্যায়”—“মন্দিরে মম কে,” “ঝুমে ঝুমে বরখে—আজু বাদরুবা”—“শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে”। ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁহার যে গান গুলিতে সুরসংযোগ করিয়াছেন, উদাহরণস্বরূপ—“অন্ন লইয়া থাকি তাই”,—তাহাতে সুর ও ভাবের সমন্বয় যেরূপ সুচারু হইয়াছে

তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানে বিরল। মোটের উপর হিন্দুস্থানী সুরজগৎ হইতে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলি আসিয়াছে—যাঁহারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহিত পরিচিত তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাহাই সব নহে। ইংরেজি সুরের অনুকরণ এবং হিন্দুস্থানী সুরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাঁহার গানগুলিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, এবং বাউল ও কীর্ত্তন হইতেও তাহারা অনেক প্রভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্য। যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের গান আমার আলোচ্য বিষয় নহে, কেবলমাত্র ইহাই আমার বক্তব্য যে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে disown করা দূরে থাক্, উহার নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট ঋণ করিতে হইয়াছে। তিনি যে surroundingsএর কথা বলিয়াছেন, তাহা সুর-শিল্পীগণের নিকট অত্যন্ত gross. রবীন্দ্রনাথের গানে অবশ্য বাণীটা বাদ দিলে শুধুমাত্র সুরহিসাবে গানগুলির দান অত্যন্ত poor কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বাণীটা একেবারে background, একটা উপলক্ষ্যমাত্র, সুরটিই সর্ব্বপ্রধান। তানসেনের যেসব গান সম্রাট্ আক্‌বরের প্রশংসামূলক, তিনি যখন সেই গান গাহিতেন, সম্রাট্ স্বয়ং, অন্যান্য শ্রোতাগণ ও গায়ক নিজে—কেহই গানের মধ্যে স্তুতিবাদের কথা মনে করিতেন না, তানসেনের দরবারী কানাড়ার অপরূপ অভিব্যক্তির কথাই হয়ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেন, নচেৎ তাঁহারা তানসেনকে তাঁহার মর্য্যাদাদান করিতে পারিতেন না। তাছাড়া তাঁহার অধিকাংশ গানই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক এবং প্রকৃতিবর্ণনামূলক,—কোন দেশ কাল পাত্র লইয়া তাহারা রচিত হয় নাই। তখনকার শিল্পীরা এক একটি বিশিষ্ট সুরে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী যুগে এবং প্রতিযুগেই বহু গুণীজনের সাধনা এবং অনুভবের

মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, ইহা ভারতীয় সঙ্গীতের সকল ছাত্রই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গীত-জগৎ একটি বিশাল সমুদ্র। এক একজন গুণীর চেতনায় এক একটি রাগের রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; দ্বিতীয় গুণী সেই রাগ-টিকেই হয়ত আবার ভিন্নরূপ দিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক স্বরটি প্রতিযুগে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে, অথচ তাহার জন্মগত স্বাতন্ত্র্য কখনও লুপ্ত অথবা ব্যাহত হয় নাই। যাঁহারা ৺পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের সুমধুর কণ্ঠের রাগালাপ শুনিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে তাঁহার রস-সৃষ্টির এমন একটি বিচিত্র শক্তি ছিল যে তাঁহার গান শুনিলে কেহ রবীন্দ্রনাথের মত মনে করিতে পারিতেন না ইহা অতীত যুগের নিছক পুনরাবৃত্তি। পক্ষান্তরে মনে হইত, ইহা একটি dynamic force, অনন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা এই স্বরলোকে রহিয়াছে। অথচ যেটা সঙ্গীতের বিজ্ঞান অর্থাৎ যে note গুলিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রুতির technique ও যে লয়ের মধ্য দিয়া এক একটি রাগ মূর্ত্তিধারণ করে, তাহা কখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, নিয়মের মধ্য দিয়াই শিল্পকলার অপরিমিত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। তানসেনের গানে আজ যদি কেহ পুলকিত হন, তবে রবীন্দ্রনাথ বলিবেন আজ তিনি জন্মিয়াছেন কেন? তবে যাঁহারই কালিদাস অথবা বিদ্যাপতি ভাল লাগিবে তাঁহারও জন্মান উচিত হয় নাই, গীতা-উপনিষদের বাণীতে যে লোক পুলকিত হইবেন তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই বরণীয়, একশত বৎসর পরে যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন, তবে এখন হইতে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াই ভাল, তিনি যেন না জন্মগ্রহণ করেন।

রাগাত্মক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দেশ কাল পাত্রের প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কোন কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাহারা

কি পরিমাণে অথবা আদৌ গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বলা কঠিন, তবে যে সুরের অভিব্যক্তিটুকু কণ্ঠে ও যন্ত্রে অতীত কাল হইতে আজ ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা নিত্য, সৌন্দর্য্যের সত্য তাহার মধ্যে আছে। যাঁহারা মাইহারের বিখ্যাত যন্ত্রী আলাউদ্দিন খাঁ অথবা ওস্তাদ হাপেজ আলি খাঁর স্বরোদ শুনিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন—প্রতিবার প্রত্যেক সুরটি তাঁহাদের হাতে নূতন করিয়া ধরা দেয়। ইহা চেষ্টায় হয় না, হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত্ত করুণা ও সৌন্দর্য্যবোধ হইতে এই সুরলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাণী এখানে পশ্চাতে পড়িয়াছে, বাণীর দান স্বতন্ত্র, সে যাহা দেয়—তাহা প্রধাণতঃ intellectকে আশ্রয় করে, কিন্তু সুরের আশ্রয় feeling, অনুভবের জগতে সুর যত সহজে ও শীঘ্র মানুষকে সচেতন করিতে পারে, বাণী তাহা পারে না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পুনরাবৃত্তি অথবা জড়ধর্ম্ম নহে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি কেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের খোসাটাই দেখিলেন এবং স্থান কাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার যে অন্তরতম সৌন্দর্য্য প্রতিযুগে সঙ্গীতরস-পিপাসুদের চিত্তে আনন্দবিধান করিয়া আসিতেছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। খোসা অর্থে বলিতেছিলাম, সঙ্গীতের technique এবং শুষ্ক পাণ্ডিত্য। কিন্তু প্রকৃত সুরশিল্পীগণের কাহারও কাহারও সহিত রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই জীবনে একাধিকবার পরিচয় হইয়াছে। তিনি কি তাঁহাদের সঙ্গীতেও বুঝিতে পারেন নাই যে হিন্দুস্থানের সঙ্গীত জড় অথবা পুনরাবৃত্তি নহে, শ্রেষ্ঠতম কাব্য অপেক্ষা একটি রাগের যথার্থ বিকাশ অধিকতর শক্তিমান এবং মনোমুগ্ধকর। তাহাদের রূপ সুরের মধ্যে বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না! যদি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অনুভবশীল ব্যক্তি ইহা অনুভব না করিয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে, শিল্পসৃষ্টির যে শক্তি, অর্থাৎ কাব্য-প্রতিভা, তাঁহাকে

সাহিত্য-জগতে এতখানি উচ্চ আসন দান করিয়াছে, সেই শক্তিই তাঁহাকে সৌন্দর্য্যলোকের আর একটা বৃহত্তম রাজ্য সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যে প্রাণধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তরের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা অল্পবিস্তর সকল শিল্পীকেই অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু অমর প্রতিভা যে শিল্পীর আছে, তিনি তাহার মধ্য দিয়াই অমৃতরস দান করিয়া যান। তাহা প্রতিযুগের ও প্রতি-কালের। Elizabethan audience চাহিত রক্তপাত ও প্রতিহিংসা। Othello এবং Hamletএর পরিকল্পনায় Shakespeare সেই জনপ্রিয় উপাদানই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের যে চিরন্তন রহস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া যদি কেহ আজ পুলকিত হন তবে কি বলিব তিনি বাঁচিয়া আছেন কেন? সদারঙ্গ অথবা অদারঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া যদি আজিকার কোন গুণী গায়ক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তবে কি বুঝিতে হইবে—শ্রোতারা সকলেই জড়পদার্থ বিশেষ? সঙ্গীতের কোন অভিজ্ঞান হইতে রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে যে সব শিল্পী জন্মিয়াছেন এবং গুণীপদবাচ্য আজও যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও রস-সৃষ্টির শক্তি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে তাঁহারা জড়ধর্ম্মী নহেন, অথবা তাঁহারা নিছক পুনরাবৃত্তি করেন না, এবং তাঁহাদেরই সৃষ্টিতে অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির পরিচয় আছে। তাঁহারা শুধু সাময়িক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর করেন না, তাঁহাদের সঙ্গীত মানুষের প্রাণে যে ভাব জাগ্রত করে, তাহা কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের নহে।

কৃষ্টি বিনিময় ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ যখন সঙ্গীতে

provincialism এর advocacy করেন, তখন একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি বাঙ্গলার কীর্ত্তন ও বাউল গানকে (যাত্রাটা কেন বাদ দিলেন বলিতে পারি না) বাঙালীর বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও এই বিশেষত্বের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "বৈষ্ণব সঙ্গীত সমস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে বাঙালীর প্রাণ আপনার সঙ্গীতকে উদ্ভাসিত করেছে।" কথাটা কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে বাঙালার কীর্ত্তন যে প্রধানত হিন্দুস্থানী সুরেরই অঙ্গ-বিচ্ছেদ করিয়া জন্ম লইয়াছিল, তাহা জানি। হিন্দুস্থানী রাগ-জগতের বিচিত্র অনুকরণ বাদ দিলে কীর্ত্তনের মধ্যে যাহা থাকে—তাহা নিতান্ত একঘেয়ে বস্তু। যাহাই হউক, সঙ্গীতে প্রাদেশিকতার স্থান নাই, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের চাল অথবা ঢং আছে, এই মাত্র।

আধুনিক কালে সমগ্র ভারতে সঙ্গীতের renaissance সার্ব্বজনীন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ ধারণা সঙ্গীতকারগণের নিকট স্থান পায় নাই। যদি গোয়ালিয়ার অথবা আলোয়ারের লোক কোনকালে সঙ্গীতের চর্চ্চায় অগ্রণী হইয়া থাকেন, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিতে বাঙালী ছাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বাঙলা আজ যে সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিতেছে, ভারতের গুণীসমাজ সেই পরিচয় সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন আজিকার দিনে ইহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

ঈর্ষা

[অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক "ছায়া"তে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা দেবী ঈর্ষা নামে একটি কবিতা লিখেন। অনেকে হয়ত কবিতাটি পড়বার সুযোগ পাননি, তাই কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম।—

ওরা কেন ঈর্ষা করে আমাদের নিরালার প্রেম ?
ভাবে কি তুমি না এলে ওরা পেত আমার প্রণয় ?
এতো বোকা হতে পারে ? ভাবি আর শুধু কৃপা হয় ;
কিন্তু তা'রা ঈর্ষা করে এ'কথায় খুশীই হলেম।

তাদেরে জানিতো আমি, শুধু চায় কদিন খেলিতে,
কয়টি চটুল কথা, নানা ঢঙে 'ফ্লার্ট' করে চলা,
ক'দিনের উত্তেজনা—তনুমনে শিহরণ তোলা,
এইতো ওদের প্রেম—শেষ হয় চলিতে চলিতে।

প্রেমের বোঝে কি ওরা উড়ে-চলা ফড়িঙের দল ?
তোমার মতন তা'রা—থাক্ সে কথায় কাজ নাই ;
শুধু ভাবি কি নির্ব্বোধ ! বুদ্ধিটা কি একেবারে নাই ?
নগ্ন কুশ্রী নির্লজ্জতা ইহাদের শুধু কি সম্বল !

তবু তোমা ঈর্ষা ক'রে ওরা দেয় সম্মান তোমার,
কৃপা হয় ! ঈর্ষাতেও ইহাদের নাই অধিকার।

বলা নিষ্প্রয়োজন, কবিতাটি চমৎকার। কিন্তু ঈর্ষা মানুষের মনে এতোই গভীর শিকড়পাত করেছে যে মানুষ শুধু মানুষের প্রেমকেই ঈর্ষা করে না, সময় এবং স্থান বিশেষে মানুষ, অমানুষ, পশু এমন কি অপ্রাণীকেও ঈর্ষা করতে পারে এবং করে। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে 'বিশ্ব'ব্যাপারে যদি কিছু ultimate সত্য থাকে তবে তা Universal Law of ঈর্ষা। সে আমাকে ঈর্ষা করছে, আমি আপনাকে ঈর্ষা করছি, আপনি অমুককে করছেন, অমুক তমুককে—এই ত বিশ্ব সংসার।

সে যাক্, ঈর্ষা ব্যাপারে শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা দেবীর "ওরা" অর্থাৎ শ্রীমানেরা যে কতদূর এগিয়েছেন আমি তারি একটা ক্রম-অবনয়ন দেখাতে চেষ্টা করেছি।—ইতি। লেখক।]

১

ড্রাইভার রবি রায়

উন্মাদসম প্রায় ভ্রমিতেছে রাস্তায় যুবা কে ?
বেলা বুঝি পড়ে এলো, সায়াহ্ন রৌদ্র যে শান্ত,
ঘন ছায়া রচিয়াছে তরুবীথি খর্জ্জুর-গুবাকে—
মধ্য-সহর নয়, আসলে এ নগরীর প্রান্ত।

'ফুটপাথে' ভাবা ফুটে দু' একটা মোটরের হর্ণে
আনমনা তরুণের তনু মনে সাড়া জাগে অমনি,
ধরণী রঙীন্ হয় স্বপ্নের রামধনু-বর্ণে
আশাভীরু শঙ্কিত বক্ষে অধীর হয় ধমনী।

এখনি আসিবে বুঝি 'বেথুনের' সুরম্য বাস্‌টি—
যুবক দাঁড়িয়ে কেন বাকি আছে এখনো তা জান্‌তে ?
—মৌন চকিত চাওয়া, ফেলে যাওয়া লঘু নিঃশ্বাসটি
তারি আশে তৃষাতুর বসে আছে রিক্ত দিনান্তে।

বাস্‌ এসে ফিরে যায়, ড্রাইভার রবি রায় কি সুখী ! !
উনি যে সুখের ভাগী ভাগ্যে জুটবে তার কিছু কি ?

২

ভৃত্য

ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে একটি যুবক এক কক্ষে,
তার পাশে বাস করে রাজপুত পরিবার একটি,
পর্দ্দানশীন বড়ো, পর্দ্দাই পড়ে সদা চক্ষে,—
কদাচিৎ তার নীচে দেখা যায় তরুণীর legটি।

এই leg-ধারিণীরে দেখেছে সে একদিন মাত্র,—
বয়স উনিশ-কুড়ি, অপূর্ব্ব সুন্দরী গৌরী ;
পর্দ্দার পিছনেই আপনারে ঢাকে অহোরাত্র,
চোখে চোখ পড়লেই অমনি পালিয়ে যায় দৌড়ি'

তারি ঘরে কাজ করে জনৈক পশ্চিমা ভৃত্য,
বয়সে যুবক বটে, গাঢ় উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণে,
তরুণীটি তার সাথে হাসে আর কথা কয় নিত্য
তাদেরি হাসির রোল পশে ওর তৃষার্ত্ত কর্ণে।

জানিনা ভাবিবে কিবা বৃদ্ধ বা পণ্ডিত প্রাজ্ঞ—
যুবাটি ঈর্ষা করে সামান্য ভৃত্যেরই ভাগ্য।

৩

Lap Dog

Lap dog পালিয়াছে ও-বাড়ীর জমিদার কন্যা,
Lap dog—যার সাথে অতীতের কতো স্মৃতি জড়ানো ;
যারে নিয়ে খেলা ক'রে ইঙ্গ রমণী কতো ধন্যা—
সভ্য সমাজে যার market value সদা চড়ানো।

সেই প্রিয় Lap dog পালিয়াছে সুন্দরী তরুণী,
সহস্র আব্দারে প্রাণীটার নাই আর রক্ষে
যত্ন-আদর কতো—স্নানাহার, 'ব্রাশ' আর চিরুণী ;
ঘন ঘন চুম্বন সহসা জড়ায়ে ধরি' বক্ষে।

রাত্রে তাহারি পাশে একটি লেপের তলে সে থাকে,
অনূঢ়ার তনুমন জুড়িয়াছে পশুটাই একেলা ;
ভীষণ দরাজ মেয়ে, বাগাতে পারবে বল কে তাকে ?—
মন নিয়ে খেলা যেন তার কাছে পুতুলের সে খেলা।

তরুণীর আশা নিয়ে যারা যায়, ফিরে এসে তাহারা
হেরে শুধু Lap dog, আর ধূ ধূ নিরাশার সাহারা।

৪

ফাউণ্টেন পেন

সাদরে দিয়েছে কিনে নিজের প্রিয়ারে যেই penটি
পার্কার নাম আর চকোলেট রঙ তার বেশ তো !
সামান্য ভীরু দান, কিছু নয়, অতিশয় scanty
তবু জানে তার কাছে নাই এর মূল্যের শেষ তো।

ভাবে—"হায় পেনটার নাই সৌভাগ্যের অন্ত—
প্রিয়া তারে সযতনে রাখিয়াছে সুশীতল বক্ষে ;
উরজ পরশ পেয়ে ভুঞ্জিছে সুখ সে অনন্ত,
বক্ষ-দোলন-লীলা হয়ত হেরিছে সদা চক্ষে।

"না জানি কি ভাবে প্রিয়া, দুর্জ্জেয় রমণীর চিত্ত !
ভাবে কি দামের কথা ? অথবা সে পেনটার পরশে
প্রিয়ের আঙল ভাবি অকারণে লাজ পায় নিত্য ?
—অথবা কি মনে পড়ে অতীতের অনুরূপ হরষে ?"

তাহার আঙুল চুপে ভয়ে ভয়ে ছুঁয়েছিল যেখানে
পেনটা আজিকে কিনা স্পর্দ্ধায় বাস করে সেখানে !

৫

লংক্লথ

ষোড়শীরে জড়ায়েছে নীল সাড়ি কি নিবিড় পরশে !
তাও নয়—তারো নীচে আশমানি ব্লাউজের কি মায়া !

ব্লাউজ বক্ষবাস! মন খানি ভরে উঠে হরষে;
তবু হায় তাও নয়, তারো নীচে আধো আধো কি ছায়া?

নব নামে কঞ্চুলী কিবা শোভা বিরচিয়া বক্ষে
দুই বাহু প্রসারিয়া বেড়িয়াছে উন্নত উরসে;
তবু সেও কিছু নয় অতলের ডুবুরীর চক্ষে—
সেমিজে সবি যে ঘেরা, আর সবে বঞ্চিত ও রসে।

শুধু নীচে, অধোবাস—হে ডুবুরী এই বার থামো না,—
সম্বর' সন্ধানী ঈর্ষা-শানানো খর অস্ত্র;
বহু দূর ডুবেছিলে, তবু হায় মেটে নাকো কামনা;
শেষটায় হতে চাও এক খানি লংক্লথ বস্ত্র?

বুকের সোনার হার, অথবা হও না কেন 'লকেট্'ই—
তোমারি বদলে বুকে তুলে নেবে stylish coquetteই

The auctioneer's clerk had come to make an inventory, and the outgoing tenant had left a bottle of port on the sideboard. Some hours afterwards the man was found asleep in an armchair, and the only entry he had made in his book was, "One revolving dining-room carpet."

প্রসঙ্গ কথা

বিদ্যুৎ কাহাকে বলে এবং বিদ্যুৎ কয় প্রকার এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দুইটির উত্তর সম্বন্ধে অবহিত না হইয়াও আমরা দেখিতে পাই, বর্ষাসমাগমে বিচিত্ররূপা নবীন মেঘজালকে উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং ক্বচিৎ কখনও বজ্ররূপে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিভ্রাট ঘটাইতেছে। এই বিদ্যুৎ স্বতঃই অক্সিজেনকে ওজোনে পরিণত করিলেও বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ ইহাকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। আমেরিকার জেদী ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইয়া একদা আকাশ-বিদ্যুৎকে মাটির কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে আবিষ্কার-যুগের কথা। ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার মাত্র করিয়াছিলেন, কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

* * *

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য কাহাকে বলে এবং এই সাহিত্য কয় প্রকারে অভিব্যক্ত হয় ইহা আমাদের সঠিক জানা না থাকিলেও বাংলা দেশে 'উত্তরা'-রূপে মাঝে মাঝে তাহার ঝলক দেখিতে পাই এবং রাধাকমল, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও মহেন্দ্রলাল-রূপ বজ্রনিক্ষেপে মাঝে মাঝে আমরা সচকিত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও অভিধানসম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ওজন স্বতঃই বাড়াইয়া দিলেও এই সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম না। হোমিওপ্যাথি-কাম-জীবনবীমা-ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও কম জেদী নন। গত বড়দিনের বন্ধে তিনি এক প্রকার ঘুড়ি উড়াইয়াই সে সাহিত্যকে

কলিকাতার টাউন-হলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা স্বচক্ষে সেই বিদ্যুৎ দেখিয়া আসিয়াছি।

* * *

দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ তো লাভ করিতেছি কিন্তু বাহিরের কানা-ঘুষায় যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে ঠিক জিনিষটিকেই দেখা হয় নাই। মনটা ছিল tabula rasa.—শাদা মন না লইয়া কোনো কিছুই বিচার করা চলে না এই মহাজনবাক্যটি আমরা আন্তরিক ভাবে পালন করিয়া থাকি। শুনিলাম Let there be a সম্মিলন—and there was a সম্মিলন। চোখ খুলিয়া দেখিলাম নিউ ইণ্ডিয়া ও গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনশিওর্যান্স কম্পানির পরিচালকবর্গ সম্মুখে সমাসীন। ভাবিলাম এই দুইটি কম্পানির বোধ হয় amalgamation হইতেছে—সেই উপলক্ষেই এই আয়োজন। বীমা-এজেণ্ট সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ভয় ছিল, উঠিয়া পলাইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় পাশে উপবিষ্ট জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি চাদর ধরিয়া টান মারিলেন। বুঝিলাম উঠা চলিবে না, হতাশ হইয়া বসিয়াই পড়িলাম।

* * *

হঠাৎ দেখি আমাদের টুনি মহিলাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিতেছে। টুনি কলেজে পড়ে, দেখিয়া ভরসা হইল, কলেজের ছেলেমেয়েরা আর যাহাই হউক শরণাগতকে ফেলিয়া পলাইবে না। বিপদে পড়িলে উহাদেরই সাহায্য লইব ভাবিয়া সম্মিলনের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণে মনঃসংযোগ করিলাম। পার্শ্ববর্ত্তীদের আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ইহা প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন। আমি ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রমাণ

কি? তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম—প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুরাশি অবলীলাক্রমে নীচের দিকে বিলম্বিত করিয়া বসিয়া আছেন। এটা যে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন তাহা প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রমাণিত করিলেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোনো একটা হারানো দ্রব্য খুঁজিতে খুঁজিতে টাউন হলের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

* * *

পার্শ্ববর্ত্তী বলিলেন, মহাশয় দেখুন আর একজন প্রবাসী বাঙালী আসিয়াছেন—আপনার সন্দেহ কি এখনো ঘুচিল না? প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে সন্দেহ অবশ্যই ঘুচিয়াছিল, কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ গাঢ় হইয়া উঠিল। বহুদিন হইতেই মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছিল, "সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়?" এবং এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বইগুলি পড়িব পড়িব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় অপ্রত্যাশিতরূপে সাহিত্য-সম্মিলনীতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়া গেল। ভাবিলাম, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন "সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়" না হয় আপাতত থাক, পরবর্ত্তী প্রশ্ন "সাহিত্য কয় প্রকার" তাহা এই সুযোগে জানিয়া যাই। কিন্তু হায়, তাহাও জানা গেল না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাহিত্য ব্যাপারে সম্মেলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নাই।" কথাটা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, সেই জন্যই ত ইনশিওর্যান্স-সম্মিলন বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল! "পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়"—রবীন্দ্রনাথ এ কথা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রচার করিলেন কেন? তাহার চেয়ে যদি বলিতেন মানুষের দুইখানি মাত্র হাত, এবং বলিয়াই

বসিয়া বসিয়া পড়িতেন, তাহা হইলেও সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাহিত্য ক্ষেত্রের বাহিরের একটা অতিপরিচিত সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বজন-পরিচিত পুরাতন একটি কাহিনীকে এরূপ জোর করিয়া প্রকাশ করিলেন কেন ভাবিয়া পাই না। মনের সৃষ্টি এবং হাতুড়ির সৃষ্টি যে এক নয় তাহা কি রবীন্দ্রনাথ এতদিন জানিতেন না, বা জানিয়াও গোপন রাখিয়াছিলেন? হায়, সাহিত্য-পালের গোদা যে কথা বলিলেন তাহাতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

*　　　　*　　　　*

বাংলা দেশের আকাশে সাহিত্য নাই, কিন্তু সেই আকাশ যে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে ছাইয়া গিয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পান "বাংলা দেশের ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্ত-পিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল, এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালী আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্ত্তন করতে তার দেরী লাগতো না—কিন্তু…বেঁচে গেছে।"

*　　　　*　　　　*

বঙ্গদেশে "আজও", (ধরা যাউক এই বৎসরে) যতগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গল্প বা উপন্যাস পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে পরস্পর আক্রমণ করিয়াছে এরূপ একখানি পুস্তকও আমাদের চোখে পড়ে নাই। গত এক বৎসরের মধ্যে (পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) বাংলা ভাষায় যতগুলি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে

"প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কাহারো বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিয়া লেখা কোনো প্রবন্ধ কবিতা বা গল্প দেখি নাই। ভারতবর্ষ ত কাহারো বিরুদ্ধেই বড় একটা কিছু বলে না, তথায় মাত্র দুই একটি এরূপ লেখা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকে গাল দিয়াছেন। এই রমাপ্রসাবাবু অবশ্য কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে গাল দিয়া বসুমতীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের ব্যর্থ গাল—কবির উপলব্ধির বিরুদ্ধে। "প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল কি না" নামক ব্যঙ্গ রচনা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক সময়ে প্রাত্নতাত্ত্বিকের গায়ে খোঁচা মারিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এতকাল পরে তাহার শোধ তুলিয়াছেন।

* * *

ভারতবর্ষের পর বিচিত্রা। কাহাকেও আক্রমণ করে বলিয়া দুর্নাম নাই। বসুমতীতে বহুদিন আগে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বিরুদ্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। মনে হয়, ইহাও এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু "বঙ্গশ্রী" কাগজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা-মূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলির অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি কাহাকেও আক্রমণ করিয়া লেখা নহে। ইহার ফলে ব্রজেনবাবুই কিঞ্চিৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সাহিত্য-ক্ষেত্রের ব্যাপার নহে, ইতিহাস-ক্ষেত্রের ব্যাপার। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস মহাশয় সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা লইয়া আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উভয় প্রকার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তুলনামূলক সমালোচনা

করিয়াছিলেন। ইহাও রক্ত-পিপাসুর আক্রমণ নহে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার আক্রমণে "পরস্পর" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে রবীন্দ্রনাথকে যদি কেহ আক্রমণ করিয়া থাকেন তবে রবীন্দ্রনাথও পাল্টা বলিতেছেন—"আজও বর্ত্তমান সাহিত্যেও বাঙালীর ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসা-মুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত।"

* * *

ইহাকেই বলে পরস্পর আক্রমণ। যাহা হউক শব্দভেদী বাণে আকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিল এরূপ তীরন্দাজ "আজও" বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহা হইলে রহিয়াছে। অপরকে গাল দেয় বলিয়া শনিবারের চিঠির অপবাদ আছে বটে, কিন্তু রক্ত-পিপাসু বাণ তাহার নহে। আকাশ ছাইয়া ফেলিবার গর্ব্বও তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিভীষিকা দেখিলেন কোথা হইতে? তিনি নিজে আক্রমণের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ত খুব মধুর নহে!

* * *

ব্যঙ্গ করিবার রীতি সভ্য সমাজে প্রচলিত বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের মত সুমার্জ্জিত, মনঃপ্রকর্ষকপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ব্যঙ্গ-কৌতুক নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজি পাঞ্চ কাগজে যখন সার জন সাইমনের পায়ে জুতার পরিবর্ত্তে ক্ষুর থাকে, মাথায় টুপীর পরিবর্ত্তে শিং থাকে, অথবা ম্যাকডোনাল্ডের লেজ বাহির হয় তখন তাঁহারা কেহই পার্লামেণ্টে গিয়া বলেন না যে ইংরেজের "ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত।" বারনার্ড শ কে লইয়া, চেষ্টারটনকে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অবধি নাই, কিন্তু তাঁহারাও কখনো সেণ্টিমেণ্টাল হইয়া উঠিয়া নিষ্ঠুরতা নির্দ্দয়তা প্রভৃতির অপবাদ

কাহাকেও দেন নাই। খ্যাত ব্যক্তি মাত্রেই পাঁচ জনের আলোচনার বিষয়। খ্যাত ব্যক্তিগণ ইহাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক, ইহাকে গ্রাহ্যই করেন না। সামান্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যাঁহাকে স্পর্শ করে, যিনি ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়েন, লোকের কাছে কাঁদিয়া বেড়ান, তিনি খ্যাত হইতে পারেন, মহৎ নহেন।

* * *

বাংলা লিপি পরিবর্ত্তন করিয়া রোমান লিপি গ্রহণের কথা উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পক্ষপাতী। ভাষার কালগত পরিবর্ত্তনের প্রত্যেকটি অবস্থার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, লিপির প্রতিও তাঁহার মমতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এইরূপ কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কোনো প্রচলিত লিপি ত্যাগ করিয়া নূতন লিপি গ্রহণের পক্ষপাতী হন, তখন বিষয়টি প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। সংস্কারগত-গোঁড়ামি যে-কোনোরূপ পরিবর্ত্তনেরই অন্তরায় হইতে পারে। কিন্তু যদি বুঝা যায়—এরূপ পরিবর্ত্তনে এক সংস্কার ছাড়া আর আর কোনো দিকেই কোনো বিরোধ নাই, এবং ইহাতে বর্ণমালা শিক্ষা এবং ছাপার কাজ অধিকতর সুবিধাজনক হইতে পারে, তাহা হইলে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থনই করিব। নিজ নিজ লিপিবিষয়ে সকলেরই অভ্যাসগত মমতা আছে, সুনীতিবাবুরও আছে, কিন্তু যে-কোনো নূতন বৈজ্ঞানিক-রীতির প্রচলনে চিরদিনই আমরা পুরাতনকে বিদায় দিয়াছি। সুতরাং আজ যদি লিপিবিষয়ে সেরূপ কোনো ত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া দুঃখ বা হাহুতাশ করা হাস্যকর।

কেহ কেহ এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে য়ুরোপের সভ্যতার নিকট আমরা আমাদের সকল বৈশিষ্ট্যই জলাঞ্জলি দিয়াছি—বাকি ছিল অক্ষর তাহাও যাইতে বসিল। বৈশিষ্ট্য বলিতে কি বুঝায় সেরূপ হাস্যকর প্রশ্ন এখানে তুলিব না, কিন্তু বৈশিষ্ট্য যদি আকার পরিবর্ত্তনেই যায়, তাহা হইলে তাহা যাওয়াই ভাল। কোনো চামড়া-তত্ত্ববিদ যদি বলেন কোনো একটা বিশেষ ঔষধ খাইলে ভারতবাসীর চর্ম্ম-বর্ণ য়ুরোপীয়দের মত হইবে এবং ফলে চর্ম্মরোগ কখনো হইবে না, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের বর্ণ-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চিরদিন পিঠ চুলকাইতে থাকিব, কদাপি সে ঔষধ পান করিব না? এরূপ বৈশিষ্ট্য ত বড় ভয়ানক! চলিবার বেলা গো-যান ত্যাগ করিলাম, ভুঁড়ি আবৃত করিয়া জামা পরিলাম, টিকি কাটিয়া টুপি পরিলাম, মোজা-জুতায় পা ঢাকিলাম কৈ আমাদের বৈশিষ্ট্য ত নষ্ট হইল না! বাঙালীর চরিত্রগত গুণ ত সবই বিদ্যমান রহিয়াছে! থিয়েটার পার্টিতে চাঁদা দিলে আজও ত রাজা সাজিবার জেদটি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিতেছে—বাঙালীর সব চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সাহিত্যিক হওয়া ইহাও ত পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই ঠেকাইতে পারিতেছে না! তবে একমাত্র লিপি পরিবর্ত্তনে বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন কেন?

* * *

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন—

> আমাদের ভারতবর্ষে অনেকগুলি লিপি প্রচলিত। সকল দেশেই লোকের নিজের দেশের লিপির প্রতি একটা টান আছে—যেমন আমাদের বাংলা লিপির প্রতি। যদি আমরা দেবনাগরী অক্ষর চালাই, সেও কতক ভাবে এক প্রদেশের

> লিপিকে অন্য প্রদেশের লিপির উপর স্থান দেওয়া হবে। তাতে অনেকের প্রাদেশিক মনে ঘা লাগতে পারে। কিন্তু সকলেই একটা নূতন অক্ষর গ্রহণ করতে রাজী হ'তে পারেন। এবিষয়ে চেষ্টা করে লোকমত গঠন করে, আজ থেকে ধরুন ২০ বৎসর পরে আমাদের নিজের চেষ্টায় আইন করে আমরা Roman অক্ষর চালালে, সে কাজটা সহজ হবে, আর মঙ্গলের ত কথাই নাই।

দেবনাগরী অক্ষর চালাইবার প্রশ্নই উঠে না। সমস্ত ভারতবর্ষের এক লিপি হউক ইহা মুখ্য নহে, লিপি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ হউক ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং দেবনাগরী কিংবা ফার্সী লিপিতে প্রাদেশিক মনে ঘা না লাগিলেও উহা গ্রাহ্য নহে।

* * *

মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শিল্প-বিভাগের সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণটি পাঠ করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া বিশেষ মুলবান হইয়াছে। বাংলা-দেশে চিত্র শিল্পী কত আছেন আমরা তাহার হিসাব জানিনা (এ জীবনে জানিবার সৌভাগ্যও হইবে না) কিন্তু চিত্রশিল্প সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারেন এরূপ লোকের দেখা পাইলাম না। শিল্পী না হইয়া শিল্প আলোচনা করা চলে, কিন্তু শিল্পের ভাষা না জানিয়া শিল্প সমালোচনা করা চলে না। ইতিহাসের দিক দিয়া, অভিব্যক্তির দিক দিয়া বিশেষ যুগের ষ্টাইলের দিক দিয়া যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই শিল্প আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু শিল্পী কোথায় প্রতারণা করিল—কোথায় সফল হইল, কোথায় বিফল হইল, ইহা বিচার করিতে হইলে বিশেষ-শিক্ষা প্রয়োজন। দেবীপ্রসাদের সেই

শিক্ষা আছে; কারণ তিনি শিল্পী, সুতরাং সমালোচনায় তাঁহার অধিকার আছে।

*　　*　　*

কিন্তু অভিভাষণে তিনি কোনো শিল্প সমালোচনা করেন নাই, দুই চারিটি প্রাণের কথা বলিয়াছেন। আমাদের শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছে। বলিবার এমন সুযোগ পাইয়া দেবীপ্রসাদ তাহা নষ্ট করিয়াছেন। "সাহিত্য-সম্মিলন" এই নামটিই তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাথর-খোদাই হাত, আর ৪০ ইঞ্চি ছাতি! হায় দেবীপ্রসাদ, শেষকালে খারাপ জিনিসকে প্রাণ খুলিয়া খারাপ বলিতে বাধিল! খুলিয়া না বলিলে যে কাহারো চেতনা সঞ্চার হয় না। দুঃখকে এরূপ ভাবে চাপিয়া গেলে দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইবে। বাংলা দেশে শিল্পের বর্ত্তমানে যা অবস্থা হইয়াছে—অন্তত মাসিক পত্রিকা মারফৎ যাহা দেশময় পরিবেষিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই শিল্পের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন সাহিত্যে, তেমনি শিল্পে এই ব্যভিচারের লীলা চলিতেছে; ইহার প্রতিবাদে কোনো ফল আপাতত হইবে না—কিন্তু তবু যদি প্রতিবাদ করিতেই হয় তবে তাহা তীব্র ভাবেই করিতে হইবে। ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামে যে ফাঁকি চলিতেছে, সে বিষয়ে দেশকে সচেতন করিবার ভার শিল্প-সমালোচকের।

*　　*　　*

দেবীপ্রসাদ বলিয়াছেন,

> অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধারা অবলম্বন ক'রে বাংলাদেশে যে নূতন আন্দোলন চলেছে—সেটাকে মোটমাট আধুনিক

ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলন বলা চলতে পারে। এই নূতন আন্দোলন চলতি হবার পর মাসিক পত্রিকার শিল্পীরা নির্দ্দয়ভাবে নরদেহের উপর অত্যাচার করলেও তাতে আনুমানিক ভারতীয় চিত্রকলার ধারা থাকায়, বিকলাঙ্গ দেহও মার্জ্জনীয় হয়ে উঠেছে। এই সব যথেচ্ছচারিতার সমর্থন করার মূলে রয়েছে ফ্যাশান বা চলতি রুচি। * * বিদেশীদের অনুকরণে মাঝে মাঝে এদেশেও এমন ছবি বার হয়, যা দেখে বুঝতে পারি, প্রতিভা এবং পাগলামির মাঝে যেটুকু প্রভেদ আছে, তা উঠিয়ে দেবার দক্ষতা অনেকে অর্জ্জন করেছেন। * * * আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার দোহাই দিয়ে মাসের পর মাস যে সব ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে, সেগুলি হয়ত শিল্পীকে উৎসাহ দেবার জন্যই সম্পাদকেরা প্রকাশ করে থাকেন ; কিন্তু এরকম ছবির প্রচারে ব্যভিচারই বেশি করে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। শিল্পীর সাধনা এবং রস-সৃষ্টির অপেক্ষা তার প্রতারণা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

এই কথাগুলি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। শিল্পী দেবীপ্রসাদ বাংলাদেশের যে শিল্পধারা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্রতম প্রতিবাদ এবং কঠিনতম ভাষা প্রযুক্ত হউক।

মহুয়া

(ময়মনসিংহ গীতিকা)

রজনীগন্ধার বনে পূর্ণিমার শুভ্র-নীরবতা,
নিরূর্ম্মি নিষুপ্ত হ্রদে ছায়াপথ ভাস্বর যেমন,
বসন্তের অরণ্যেতে ক্ষণতরে স্তব্ধ ব্যাকুলতা,
তেমনি ঘুমায় বালা, মহুয়া সে ; এবে তার মন
নীড়ে-ফেরা পাখী সম, বিস্মরিয়া সুদূর কানন
বিস্মরিয়া দিবসের সঙ্গীহীন বিশাল আকাশ
স্মরিছে একটি মুখ, নেহারিছে একটি স্বপন ।
একটি প্রেমের স্মৃতি নাশ করে সকল আভাস
বিরাট গগন-পটে লক্ষ তারালুপ্তকারী যথা পৌর্ণমাস ॥

স্বর্ণ সৌরকর সম মিলনের স্মৃতির মৃণাল
অগ্নিবর্ণে নেমে গেছে তলহীন হৃদয়ে তাহার ;
কি বা সে নাগিণীদল ভেদ করি বাসনা-পাতাল
ললিত-তরল-নৃত্যে খুঁজিতেছে আলোকের পার !
কৌতূহলী চন্দ্র করে উদ্ঘাটিত যেমন অপার
পাথারের গূঢ় লীলা, জলতল উপল-চিক্কণ ;
স্বপন-সাগর মন্থি অধরের হাসি-রেখা তার
স্মৃতিসুধা সঞ্জীবিত প্রকাশিছে ব্যর্থ সে জীবন,
অগাধ সাগরতলে শূন্য যথা কমলার রত্ন সিংহাসন ॥

স্বপন-সোপান-স্বর্গে অবতরি হৃদয়ে তাহার
দেখিলাম ভূলুণ্ঠিত একখানি পদ্ম শতদল ;
স্মৃতির পাপড়িগুলি একে একে উঘারিয়া তার
জীবনের মধুকোষ, অকথিত বাণীতে অচল।
মহুয়া বেদের মেয়ে, দেখাইয়া ব্যায়াম কৌশল
ভ্রমে দলবলসহ ; এই মতে কাটিত জীবন।
হেন কালে চাঁদ সনে অকস্মাৎ দেখা তার হল !
বুঝিল মহুয়া নারী, সবিস্ময়ে দেখে নিজ মন,
কৈশোর-শিথান প্রান্তে নিশান্তে লভিল যেন অপূর্ব্ব রতন ॥

সেই হতে দিনে রাতে কভু একা সজনে বিজনে
বিথারি' আপন মন চাহিয়াছে বুঝিতে তাহারে ,
অলক্ষ্য আলোকলুপ্ত আকাশের উচ্চতম কোণে
তৃষার্ত্ত চাতক সে যে ; সে কি আসে নয়নের পারে ?
মাঝে মাঝে সচকিয়া বুকফাটা তপ্ত হাহাকারে
আপন নিশানা দেয়, ওরে মুগ্ধা, সেই মন হায়
ধরা কি কখনো দেয় জগতের কঠিন বিচারে !
সে মানসী পা ফেলিয়া চলে রক্ত ব্যথায় ব্যথায়,
জরির জড়োয়া হানি ধায় সে ছলনাময়ী হাসির আভায় ॥

কি ছিল চাঁদেব চোখে না বুঝিল অবোধ বালিকা,
পুরুষের আঁখি হায়, সে যে হেন পরশ-রতন
কে জানিত আগে তাহা ! ভালে তার কি রহস্য লিখা
যৌবনের অশ্বমেধে ছুটিয়াছে তুরিত-চরণ
জীবনের তুরঙ্গম। মুগ্ধ বালা করিল অর্পণ

কোকিল-ব্যাকুল এক বসন্তের নীরব নিশীথে
প্রেমের বেদিকাতলে তার সর্ব্ব দেহ প্রাণ মন।
শৈশবের খেলাঘরে বেহাগের ব্যথার ইঙ্গিতে
যে জাগিল প্রেম সে কি? নাহি ভেদ তবে কিগো
গরল-অমৃতে?

কে মিশালো সমভাগে প্রেমপাত্রে অমৃতে সুধায়,
নন্দনের হেমপাত্রে অকস্মাৎ-বেদনার খাদ!
ছিঁড়িয়া মোতির মালা তারে দিয়া কে অশ্রু বানায়,
কোন্ দুষ্ট রাহু হায় গ্রাস করে চুম্বনের চাঁদ!
দুরন্ত সমুদ্রতটে কেবা রচে বালুকার বাঁধ
নিতান্ত কৌতুকভরে! হায় বালা চেয়ো না বুঝিতে
প্রণয়ের পরিণাম জীবনের রহস্যে অগাধ;
সহজে ভাসিয়া যাও পাবে কূল সোনার তরীতে,
অতলে তলাও যদি নাহি তল, নাই তীর মৃত্যুর নিভৃতে॥

ডুমরা বাদিয়া ছিল মহুয়ার পিতা; ভাসমান
মেঘসম গুটায়ে কানাৎ তাঁবু দলবল সহ
অশ্ব, ছাগ, অশ্বতর আর লয়ে ইজ্জত সম্মান
চলিল সুদূর দেশে; "মাণিক রে এ ব্যথা দুঃসহ!
থাক্ পড়ে জমি জমা, হেথাকার আবাস ত্যজহ;
আমার কুলের মেয়ে, পাহাড়ের বনেদি বাদিয়া,
সে হবে রাজার বউ! দূর বনে এখনি চলহ।"
ছাড়িয়া বামুনকাঁদি নিশীথের আড়াল লভিয়া
চলিল বেদের দল, চলিল মহুয়া সাথে দীর্ঘ নিশ্বসিয়া॥

যে-দুঃখে রাজার ছেলে নিক্ষেপিয়া রাজত্ব সম্বল
পথিকের দীক্ষা লয় ; নিরাশার নিকষ-শিলায়
আপন হৃদয়ক্ষত, একমাত্র উষার উজ্জ্বল
বাসনার রক্তরাগ, তারি লুব্ধ হাত ছানি, হায়,
(ব্যাকুল কমল যথা মানসোৎকা হাঁসের পাখায়)
চাঁদেরে উদাসি' দিল। ছাড়িল সে গৃহ ধন জন।
বহুদেশ ভ্রমি একা, বহুকাল সহি নির্ব্বাসন,
সোমেশ্বরী নদী তীরে, আজিকে সন্ধ্যায় দোঁহে হয়েছে দর্শন ॥

ঘুমায় মহুয়া সুখে . জীবনের জটিল বনের
শাখা প্রশাখার ফাঁকে চিরকাল যে শশী ভাস্বর,
তাহারি একটি রেখা, আজি তার বিরহী মনের
ব্যথার ব্যর্থতা পরে, বাসনার সোনায় সুন্দর
গড়িছে বাসর-কক্ষ। ভেঙে ভেঙে পড়ে নিরন্তর
জগতের তরঙ্গিনী জীবনের এক উপকূলে
জাগে স্বপনের তীরে নবদেশ শ্যামল উর্ব্বর।
যে মেঘ কাঁদিয়া গেল পূর্ব্ববায়ে মন্দ পাল তুলে
সে পুন ছুটিয়া নামে ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর গিরিদ্বার খুলে ॥

নারদের বীণাচ্যুত মন্দারের মালাগাছি সম
লুটায় মহুয়া ঘুমে—অরণ্যের পল্লব-শয্যায়
নয়ন-নিমীল সুখে, চন্দ্রকর যেন নেত্রবম
রজনীগন্ধার পুষ্প পেলবতা চোর ; এবে হায়,
চরণের চঞ্চলতা, কাঁপিত যা ঝঙ্কৃত বীণায়

আলোর ঝলক সম শ্রোত্ররপেয় সে সঙ্গীত ধার
আপনারে অনুবাদি' ভাস্করের স্ফটিক-ভাষায়
নীরব গরবে মরি ; এলায়িত কৃষ্ণ কেশভার
বিস্মৃতির বৈতরণী, মৃত্যুর রহস্য বহি অতল অপার॥

বিদেশী বঁধুর মুখ আজি তার জাগিছে স্মরণে!
নদীর কল্লোলে আর, বসন্তের চাঁদের ইঙ্গিতে,
স্মৃতির তুফান ওঠা সোম-গন্ধী মল্লিকার বনে,
যামিনীর মৌনভেদী অকারণ করুণ সঙ্গীতে,
অকস্মাৎ সেতু-গাঁথে জনমের ভবিষ্যে অতীতে।
ক্ষণিক আকার পায় জীবনের ক্ষীণ-বৃন্ত সাধ,
সুমেরু সুবর্ণপদ্মে ফোটে তাহা চিত্তের নিভৃতে।
একখানি কাম্য মুখ. চারিদিকে সমুদ্র অগাধ,
সুখসুপ্ত ধরণীর স্বপ্ননেত্রে যথা কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ॥

সহসা জাগিল বালা, নেহারিল আঁখি কচালিয়া,
ও কি ও খদ্যোৎ জ্বলে, অসময়ে মেঘ-আড়ম্বর!
না, না, ও জোনাকী নয়, আঁখি-দ্যুতি বন উজলিয়া,
অন্তর্গূঢ় ঈর্ষ্যারূঢ় হুমরার বজ্র গর্জ্জস্বর।
"আর কত ঘুমাওরে। চোখ মেলে জাগো মা সত্বর ;
আমার কুলের সর্প এতদূর এলো মাটি খুঁড়ি!
চিরদিন গৃহবাসী, সেই হবে বাদিয়ার বর!
পথিকের কণ্ঠহার অবশেষে সে করিবে চুরি?
যাও মা মহুয়া তারে স্বহস্তে বধিয়া এসো, এই লহ ছুরি॥"

উঠিল মহুয়া ধীরে ; পূর্ণ শশী মেঘে দিল ঢাকি।
দেখিল ক্ষণেক কাল, বুঝিল সে এ নহে স্বপন ;
উত্তর প্রত্যাশাব্যগ্র হুমরার নিশাচর আঁখি
ছোটে বা কোটর ত্যজি ! শ্বাস রুধি করিল গ্রহণ
শীতান্তে জাগ্রত তপ্ত তক্ষকের জিহ্বার মতন
খরশাণ ছুরিকারে ; তারপরে গেল পায়ে পায়ে,
নদীর উজান-ঠেলা মন্দগতি তরণী যেমন,
শ্যামশষ্প শয্যাপরে ডোরা-টানা শালবনচ্ছায়ে
শিথানে রতন-পাওয়া নির্ভব নিষুপ্ত চাঁদ যেথানে ঘুমায়ে ॥

রাতের স্বপনে যেবা ভোর বেলা দেখে মূর্ত্তিমতী
তাহারি আগ্রহভরে, অকস্মাৎ উঠে বসে চাঁদ ;
"মহুয়া মহুয়া, সখী, ভাগ্য মোর সুপ্রসন্ন অতি।
উদ্বেল বাসনাবারি লঙ্ঘিল কি নিষেধের বাঁধ,
অয়ি মোর কামনার কমনীয় কনক নি-খাদ।"
নীরব মহুয়া, শুধু বিকম্পিত বেতসীর মত
কাঁপিল সে সারা অঙ্গে ; চারিদিকে স্তব্ধতা অগাধ ;
প্রাণপণে দীর্ঘশ্বাস-চেপে-রাখা মহুয়ার, হায়;
অঞ্চল আড়াল হ'তে খসে পড়ে ছুরিখান, প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায় ॥

কাঁদিয়া মহুয়া বলে—"মোরে তুমি, ছেড়ে দাও প্রিয়,
ওই তো গহিন্ নদী, জলে তার আমি ডুবে মরি।"
"তার চেয়ে প্রিয়তমা সে তটিনী তুমি সে হইও
অনন্ত যৌবনে তব আপনারে সমর্পন করি
অতলে ডুবিয়া যাব, প্রাবদগ্ধ জীবন বিস্মরি।

মৃত্যু কি ভীষণ এত ! জীবন কি এতই আশ্রয়
জীবন মরণাতীত প্রণয়ের গর্ব্ব বক্ষে ধরি !
এ জীবন-উত্তরীয় বহুবার হয়েছে নিশ্চয়
অনেকের প্রেমে রাঙা ; তোমার চরম প্রেমে হোক্ তা অক্ষয়॥

"জীবন-উত্তরী মোর কত পূর্ব্ব জনমের প্রেমে
নাহি জানি অপ্রমেয়, কত নববনচ্ছায়াতলে
প্রণয়কুসুম স্পর্শে বারম্বার গিয়েছিনু থেমে
এক কাননের ফুল অন্য বনে ফেলি খেলাচ্ছলে
জীবনের ছায়াপথে উত্তরিয়া আসিয়াছি চ'লে।
তবু তার গন্ধটুকু ! অলক্ষ্য সে গন্ধের মালিকা
চকিতে চমকি দেয়, নবতন প্রেমের কল্লোলে।
হৃদয়-দেহলি-তলে আজি লক্ষ প্রেম দীপালিকা,
একটি জীবনে হেরি শতপূর্ব্ব প্রণয়ীর অঙ্গুরীয় লিখা।

"মৃত্যুরে না করি ভয়, যদি পাই প্রেমের আশ্বাস।"
মহুয়া কহিল ধীরে,—"নাহি ব'লো মরণের কথা,
কেবল প্রভাত হবে, জীবনের মিটে নাই আশ,
এখনো রয়েছে বাকি সায়াহ্নের নীরব নম্রতা
তারপরে অবশেষে নিশীথের স্তম্ভিত স্তব্ধতা।
তার চেয়ে চল যাই, রজনীর থাকিতে থাকিতে
অন্ধকার অবশেষ, অন্য দেশে, সুখ আছে যথা !
আছে দুটি তাজি ঘোড়া, মোর জানা, বনের নিভৃতে,
ঘুমায় বেদের দল শিকারের পরিশ্রমে বিশ্বসিত চিত্তে।"

২

চামেলী-চমক লাগা শশী-রাকা নীরব শর্ব্বরী
পাখী-জাগা, আলো-আঁকা ছায়া-ছাকা পথে
যুগল ঘোড়ার ক্ষুরে রহি রহি উঠিল শিহরি ;
এ শাখে কোকিল ডাকে, কুহুস্বর অন্য শাখা হতে,
সুরের বসনখানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুস্রোতে।
ধরণীর রসোচ্ছ্বাস কুসুমের অজস্র বুদ্বুদে
অসহ্য প্রাণের ভরে বৃন্তপরে কাঁপে শতে শতে,
মৃত্যুর ললাটে দেয় জীবনের পত্রলেখা খুদে,
সৌরভের স্বয়ম্বরে প্রাণস্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে ॥

চাঁদ মহুয়ার অশ্ব বাহিরিল বনভূমি হ'তে
সম্মুখে বিস্তার মাঠে পূর্ণিমার পূরন্ত জোয়ার ;
ডুবেছে পৃথিবী যেন ধবলিত জাহ্নবীর স্রোতে ;
খুদিয়াছে বিশ্ব ছবি যেন কোন্ কারু কর্ম্মকার
শুভ্র হস্তিদন্তপটে ; দাক্ষিণ্যে কি দিগ্বধূ বালার
রাশি রাশি কুন্দ বেলা নিশি গন্ধা মল্লিকা মালায়
বর্ষিল অজস্র-ধারে ; পানপাত্র আজি দেবতার
উচ্ছ্বসিত সোমরসে উদ্বেলিত কানায় কানায়
উৎসারিত সে মদিরা স্বর্গমর্ত্ত রসাতল দ্যুলোক ডুবায় ॥

না, না, না, ভেঙেছে আজি চন্দ্রমার মধুচক্র খানি।
পরাগপাটল পাখা তারকার মধুমক্ষী যত

কনক-চাঁপার মধু সযতনে রেখেছিল আনি
দ্যুলোকের দিব্য-চক্রে ; দুর্ব্বিষহ রসভারে নত
সে মধুমাধুরী মদ লক্ষ স্রোতে ক্ষরিছে নিয়ত
স্বর্ণায়িত ত্রিভুবনে ; হায় সৌম্য হে ওষধিপতি
বুকে চাপি কাঁদে বিশ্ব চিরন্তন বেদনার ক্ষত।
বিরহখাণ্ডবদাহে ধরাতল বেয়াকুল অতি
আছে কি সে সোমলতা ভুলায় যা জীবনের সর্ব্বলাভ ক্ষতি ॥

চাঁদ ছোটে আগে আগে, পিছে ছোটে মহুয়া সুন্দরী ;
মদনের ধনুচ্যুত দুইখানি শরের মতন
ছুটিছে দুইটি অশ্ব ; কাননান্ত উঠিল শিহরি
নিশান্তের শীত বায়ে ; সোমেশ্বরী ভাঙিয়া স্বপন
আবর্ত্তিল তরঙ্গের জপমাল্য নিয়ত যেমন।
ক্বচিৎ পাখীর রব, ভীত শিবা ছুটে চলে যায়,
দূরে অশ্বক্ষুর দোঁহে সচকিতে করিল শ্রবণ,
ক্ষণেক থমকি থামে, থামে ধ্বনি, বোঝে শেষে হায়,
নিজেরি ঘোড়ার ক্ষুর প্রতিধ্বনিরূপে যেন তাদের ভয়ায় ॥

সহসা দেখিল দোঁহে পশ্চিমের দিগন্তরেখায়
পদ্মবনমধুরক্ত প্রৌঢ়হংস চন্দ্রমা সুধীরে
নামিছে স্থগিত পক্ষে, মন্দাকিনী তীর ত্যজি হায়
জাহ্নবী-পুলিন-পটে ; অতিদূর পূর্ব্ব গিরিশিরে
উষসীর পূর্ব্বরাগ ; বীণ্‌কার ভৈরবীর মীড়ে
তুলিছে মূর্চ্ছনা যেন ; সুখসুপ্ত দিগ্বধূ বালার
ঘুমে জাগরণে দ্বন্দ্ব, কভু আলো কখনো তিমিরে।

পূর্ব্বাশা পালঙ্কপরে লীলাময়ী দিক্-অঙ্গনার
নয়নে অধরে আলো, অসম্বৃত কেশপাশে নিশার আঁধার ॥

নীরব বজ্রের গর্জ্জে অকস্মাৎ উদিল সবিতা
বেদনার বেদমন্ত্র ; অন্ধকার তমসার তীরে
উদাত্ত উদ্বেগময়ী যেন আদি কবির কবিতা।
থামিল মহুয়া চাঁদ, পশ্চিমেতে তাকাইল ফিরে
সূর্য্যচন্দ্র উদ্ভাসিত উদয়াস্ত দুই গিরি শিরে।
যুগল কনককর দুই দিকে পড়িয়াছে লুটি,
দোঁহার ধরিয়া কর দুইজনা সম্ভাষিছে ধীরে।
স্বপ্নে আর জাগরণে ক্ষণতরে ভেদ গেছে টুটি,
নিসর্গের মানদণ্ডে সুধাস্যন্দী সৌন্দর্য্যের তুলাপাত্র দুটি ॥

বসন্তের সুপ্রভাত ! গ্রামপ্রান্তে কোকিলের স্বর ;
শিশিরে শ্যামল মাঠ ; মাঠে মাঠে ক্ষেত গোধূমের ;
শ্যামল আঁধার আর পদ্মমৃদু স্বর্ণ রবিকর ;
নদীমুখী কিশোরীর পায়ে লাগি ঝরে শিশিরের
লঘু স্বচ্ছ মুক্তাদল ; জড়াইয়া যুগল অশ্বের
ক্ষুরে ক্ষুরে ফল্গুরস ফাল্গুনের কুসুমেরি রাশি
দলিল' যা সারা রাত ; দুই জনা দেখে দুজনের
কপালের স্বেদ লেখা, ওষ্ঠাধরে ক্ষীণবৃন্ত হাসি,
অধরে মিলন তৃষা, নয়নে নয়নে জাগে উদাসিয়া বাঁশী ॥

ফাল্গুনের বেলা বাড়ে ; দুই অশ্ব তীরের মতন
প্রান্তরের বক্ষভেদী লক্ষ্যমুখী ছুটে চলে যায় :

কুণ্ডলিত চক্রবাল ধীরে ধীরে করে আবর্ত্তন
দু' পাশের তরুশ্রেণী হুস্ করি ছুটিয়া পালায়।
ক্লান্ত অশ্বমুখ হ'তে রাশি রাশি ফেন-মল্লিকায়
আঁকিছে পথের চিহ্ন ; বিলম্বিত বাতাসের স্রোতে
মহুয়ার চুল হতে সুরাগন্ধী সুরভি কষায়
হানিছে চাঁদেরে কশা ; সংসারের পাঠশালা হ'তে
পলাতক দুইজনা, প্রলয়ের উল্কাসম আপন আলোতে ॥

আজ বহুদিন পরে জীবনের আবর্জ্জনা হ'তে
মুক্তির দিগন্ত 'পরে দেখা দিল প্রণয়ী দুজন।
জানি জানি ভেসে যায় নিম্নমুখী কালিন্দীর স্রোতে
সকল সান্ত্বনা আর ধন জন সৌন্দর্য্য যৌবন।
তবু যা ফেরে না আর, জপমাল্যে নাহি আবর্ত্তন,
তারি লাগি কবিচিত্ত নিশি দিন কাঁদিয়া উন্মনা।
কোটালের বন্যা এ যে, এ যে হায়, নিশান্ত স্বপন,
গরল মাণিক্যময় এযে হায় জীবনের ফণা,
যে স্পর্শমণির স্পর্শে জীবনের সর্ব্বগ্লানি হ'য়ে যায় সোনা ॥

রমণীর রূপ আর পুরুষের সবল যৌবন
হে বিধাতঃ শক্তিহীন! তুমি শুধু, পার একবার
মানবে এ বর দিতে। তারপরে সুদীর্ঘ জীবন
স্কন্ধে করি বহে চলি দুর্ব্বিষহ সুখস্মৃতি তার
এইতো সংসার লীলা! তার চেয়ে চাঁদ মহুয়ার
ক্ষণিকের অবকাশ শতগুণে লক্ষগুণে শ্রেয়।

অশ্ব এক, নারী এক, সম্মুখেতে দিগন্ত অপার,
কালসর্পে পাল্লা দিয়ে অবিশ্রাম ছুটে চলে যেও,
অবজ্ঞার কশা হানি ; এইত জীবন, আর বাকি তো দুর্জ্ঞেয় ॥

বয়স বাইশ যবে, আর যবে, নারী সপ্তদশী,
ধরাতে বসন্ত যবে, বনতল উঠেছে ফাল্গুনি',
মণি-গলা নভতলে জাগে যবে স্বপ্নহানা শশী,
বাসক-শয়নমুখী নূপুরের মৃদু রুনরুনি
সঙ্কোচে সার্ব্বসে যবে সন্তর্পনে ধীরে দেয় বুনি
বাসনায় বেদনায় ব্যাকুলতা আশা-আকাঙ্ক্ষায়
সেই তো জীবন মূঢ় ! যবে শুধু, দূর থেকে শুনি
মনে শুনি কানে শুনি, ধরিবারে দেহ ধেয়ে যায়
অতৃপ্ত তৃষার রথে জীবনের পথে পথে চির-মৃগয়ায ॥

চাঁদ মহুয়ার অশ্ব অবশেষে প্রবেশিল বনে ;
পথহীন অরণ্যের অবিরাম আদিম মর্ম্মরে
উর্ব্বশীর হাহাকার বিস্তারিয়া ব্যাকুল পবনে
কাঁদিতেছে নিরন্তর ; বিকশিত শ্যাম তৃণপরে
প্রভাতী শিশিরকণা নাহি শোষে খররবি করে
হেন সে গহন বন ; জোনাকীর সনে জ্বলে যথা,
শ্বাপদের দীপ্ত আঁখি, সে নিভৃতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে
সরীসৃপ-শীতলতা ; কানপাতা সতর্ক স্তব্ধতা
অধরে তর্জ্জনী রাখি শুনিবারে চাহে যেন অন্তরের কথা ॥

কিংশুকের কশাঘাতে আরক্তিম বনবীথি দিয়া
যুগল প্রণয়ী ধায় ; বসন্তের আতপ্ত বাতাস

মহুয়ার খোঁপা হতে একটানে লয়েছে খুলিয়া
রবিরে আড়াল-করা ঘুমে-ভরা দীর্ঘ কেশপাশ,
জীবনের ব্রণ 'পরে মরণের স্নিগ্ধ পূর্ব্বাভাস।
"হে সুন্দরী মুখে তব জনপূর্ণ জীবনের জ্যোতি,
নিবিড় কুন্তলে তব তলহীন মৃত্যুর আশ্বাস,
অধরে গরল তব, দুটি নেত্রে অমৃত-মিনতি,
মর্ম্মর-নির্ম্মল দেহে জীবনে মরণে তুমি, সেতু-মূর্ত্তিমতী॥

"তুমি সখী রন্ধ্রহীন জীবনের কঠিন পাষাণে
সুদূরে নিকটে-আনা স্বপ্ন-হানা মুগ্ধ বাতায়ন।
ভাঙিলে প্রাকার ক্ষুদ্র, প্রকাশিলে বিস্মিত নয়ানে
মেঘের কাজল-পরা অতিদূর শিখর, কানন।
নিমেষের দ্রাক্ষা-পেষা সুদূরের মদিরা উন্মন
আমার বীণায় তুমি ছায়াময়ী বেহাগের মীড়,
যে-কথা পড়েনা মনে, করে শুধু হৃদি উচাটন,
তাহারি সঙ্কেত তুমি; শুধু যবে রজনী গভীর,
রজনী-গন্ধার গন্ধে স্বপ্নেরে করিয়া দাও চঞ্চল অধীর॥"

থামিল যখন চাদ, মহুয়ার ফুটিল অধরে
অর্থহীন ভাবে ভরা হাসি; যবে নিশীথ শেষের
শরৎ-পূর্ণিমা-চন্দ্র ধরণীর কুয়াশার পরে
বুলায় পরশ খানি, জাগাইয়া রেশমী-রেশের
উর্ণাতন্তু ইন্দ্রজাল, তুলনা কি সে স্মিত হাস্যের?
সে হাসি বোঝে না সবে, বোঝে যার আছে শুধু মন।

নাম করলে সকলেই চিনতে পারবেন; তা' ছাড়া মানহানির আশঙ্কা আছে। অতএব সভ্যদের নাম গোপন করাই ভালো। আমি প্রত্যেককে, তাঁর পেশা (অর্থাৎ তিনি নিজেকে যা' মনে করেন) ধরে উল্লেখ করব। কিছুই বাদ নেই; ইঞ্জিনীয়ার, সঙ্গীতবিদ, জর্ণালিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, প্রফেসার, প্রফেসার-পত্নী ও তাঁর অনুজা। প্রফেসার-পত্নী এই চক্রের প্রতিষ্ঠাত্রী। উদ্দেশ্য মহৎ,—সভ্যদের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। এবং এ যে সফল হয়েছে তা বলতে হবে, কেননা প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে আমরা এখানে সমবেত হয়ে চা খাই, এবং ঘণ্টা দুয়েক সময় পূর্ব্বোক্ত ভাবে ব্যয় করি। আজ অসুবিধা হয়েছে এই যে 'কমন-বাট্' অনুপস্থিত; এবং অপর সকলেই এত সতর্ক হয়ে আছে যে আক্রমণের ছিদ্র পাওয়া যাচ্ছে না।

এ রকম অবস্থায় রাগ হবারই কথা। প্রফেসার-পত্নীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে বাঙলা দৈনিকের এক পয়সার সান্ধ্য সংস্করণ হাতে করে শ্রীমতী অনুজা আবির্ভূত হল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—"দেখেছেন, আজ বিকেলেও তিনজন মেয়েকে পুলিস অ্যারেষ্ট করেছে; বড়বাজার দিয়ে প্রসেশন করে যাচ্ছিল—"

কথা বলবার উপলক্ষ্য পেয়ে সকলেই তৎপর হয়ে উঠল। জর্ণালিষ্ট লাফিয়ে উঠে বললে—"তাই নাকি? তার পর? তারপর?—"

অনুজা বললে—"কোর্টে নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

জর্ণালিষ্ট পুনরায় বসে পড়ে বললে—"তা' আমি আগেই জানতাম।"

অনুজা চটে বললে—"তার মানে?

"মানে মেয়ে বলেই অত সহজে রেহাই পেয়েছে—

এর পরে সভা সরব হয়ে উঠতে দেরী হল না।

প্রফেসার-পত্নী নারী-প্রগতির পাণ্ডা। মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ছোটখাটো (মেয়েদের) সভায় বক্তৃতাও করেছেন অনেক। সম্প্রতি কিছু অসুস্থ; এবং সেইজন্যে এবারকার 'মুভমেণ্টে' যোগ দিতে পারছেন না বলে স্বামীর প্রতি তাঁর আক্রোশের সীমা নেই। অনুজা তাঁর উপযুক্তা শিষ্যা। খদ্দর ছাড়া পরে না; একবারও জেলে যেতে পারে নি বলে নিরতিশয় দুঃখিত। সে এ কথায় বোমার মত ফেটে পড়ল।—"আহা! মেয়ে বলেই ছেড়ে দিয়েছে! এবারকার মুভমেণ্টে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কমটা কি করেছে শুনি?"

সঙ্গীতবিদ মেয়েদের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। সে একবার একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কারণ দেখিয়ে অনুজার দুঃখে এমন গভীর সমবেদনা দেখিয়েছিল যে অনুজা সত্যিই মনে করেছিল—দুঃখের কারণ বাস্তবিকই ঘটেছে, কিন্তু সে টের পায়নি। সে বললে—"কিছুমাত্র নয়! স্বয়ং মহাত্মাজীও বলেছেন—"

বৈজ্ঞানিক সঙ্গে সঙ্গে অবিচলিত স্বরে বললে—"অনেক।"

প্রফেসার-পত্নী ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে—"কি কি শুনতে পাই না?"

বৈজ্ঞানিক বললে—"ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিটেল জর্নালিষ্ট দেবে। কিন্তু অনেক কম করেছে। পুরুষের চেয়ে তাদের শক্তি কম,—এই বৈজ্ঞানিক কারণে কম করতে তারা বাধ্য। এর ওপরে মহাত্মারও হাত নেই—"

অনুজা জ্বলে উঠল। "ওটা আপনাদের একটা বুলি। হয়ত

একমাত্র শরীরের শক্তিতে একটু কম,—তাও আজকাল আমেরিকান মেয়েরা—"

বৈজ্ঞানিক বাধা দিয়ে বললে—"সব শক্তিতেই কম। শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, আর্ট, সায়েন্স—যে দিকেই তাকাবেন—উল্লেখযোগ্য কিছু—"

কথাটা শেষ হতে পেল না। "নিজেদের তৈরী শাস্ত্র আর পুরাণ-ইতিহাসের বড়াই আর করতে হবে না; খুব বাহাদুর! কিন্তু আর্ট আর সায়েন্সে—কেন লীলাবতী, খনা, মাদাম কুরি, সাফো, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—"

"এবং অনুজা—" সাহিত্যিক জুড়ে দিলে। জমে আসছে দেখে সে খুসী হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীতবিদ্ গম্ভীর হয়ে পড়ল, এবং বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললে।

"যুক্তিতে পেরে না উঠলে ঠাট্টা করা ছাড়া আর উপায় নেই। আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই চিরকাল মেয়েদের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছেন—"

প্রফেসার উচ্চ হাস্য করল। প্রফেসার-পত্নী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে, ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলবার উপক্রম করছেন,—এমন সময়ে মোটরের হর্ণ দিয়ে ডাক্তার এসে উপস্থিত। অতি মধুর প্রকৃতির লোক। ব্যস্ততা মোটেই ভালোবাসে না। মেয়েদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায়। সাধারণতঃ রাত্রি বারোটার পরে সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়; এবং রাত্রি দুটোর সময় কারো বাড়ী গিয়ে চা' খেতে চায়। আজ খুব সকাল-সকাল এসে পড়েছে। মোলায়েম স্বরে টেনে টেনে বললে—কী—ব্যাপার কী? অত এক্সাইটেড হবেন না—এ অবস্থায়। এ দিকে তিনটি মাস—আর ও দিকে তিনটি মাস—

বুঝেছেন—এই ছ'টি মাস দেশের কাজ আর নারী-প্রগতি—ওসব একেবারে বন্ধ—বুঝেছেন—"

প্রফেসার বললে—"The greatest service you can do to the country—is to present her with handsome healthy children!"

জর্ণালিষ্ট বললে—"ঐ ত! আপনাদের মেডিক্যাল সায়েন্স পুরুষ-দের তৈরী বলেই না মেয়েদের ওপর এত অবিচার! থাকত মেয়ে-দেব হাতে ক্ষমতা—"

তাহলে কি হত তা' আর সে বললে না। প্রফেসার-পত্নী তার দিকে একটি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

প্রফেসার বললে—"না, না, রাগের কথা নয়; সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও দেখতে পাই,—প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরে মেয়ে। সুতরাং—"

ডাক্তার বললে—"পেল্লাদ দু' কাপ চা তৈরী কর, বাবা। (প্রফেসার পত্নীর প্রতি) ভয় নেই, আমি আপনার দিকে আছি।"

সাহিত্যিক বললে—"শুধু তাই নয়, মেয়েরা যে পুরুষের থেকে—কম—(বলতে যাচ্ছিল 'ছোট'—সামলে নিলে)—তার আরো প্রমাণ এই যে পুরুষের দেহের অংশবিশেষ নিয়ে মেয়ে তৈরী হয়েছে—"

অধ্যাপক পত্নী অনুজাএকসঙ্গে বললেন অর্থাৎ?—মানে?—

বৈজ্ঞানিক বললে—"কেন সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলে—"

প্রফেসার-পত্নী স্বামীর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলেন। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বললেন—"না না, আদিরসাশ্রিত কিছু নয়; ভয় নেই—"

জর্ণালিষ্ট ইতিমধ্যে কোথা থেকে একখানা Old Testament এনে হাজির করেছিল। একটা ঝগড়ার সূত্রপাত দেখে সে এত খুসী হয়েছিল যে সিগারেট বাক্স খুলে বৈজ্ঞানিককে একটা সিগারেট

দান করে ফেললে। তারপরে চট করে বাক্সটা পকেটে পুরে ফেলে বললে—"প্রমাণও হাজির।" বলে বাঙলা তর্জ্জমা করে পড়ে গেল।

"সৃষ্টি তত্ত্ব। প্রথম অধ্যায়। ১। আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।...

সঙ্গীতবিদ্ বিরক্ত হয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসল। বৈজ্ঞানিক মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। ডাক্তার ঈজি-চেয়ারে আরাম করে বসল। জর্ণালিষ্ট পড়ে চলল—

"এবং ঈশ্বর বলিলেন—'তখন আলোক হউক; এবং তথায় আলোক হইল—"

"Must have been a great electrical engineer"—ইঞ্জিনীয়ার বলে উঠল।

"এইরূপে তিনি প্রথম দিনে দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম। দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম। তৃতীয় দিনে ঈশ্বর সমুদ্র, মাটি, গাছ, ফল, ঘাস এবং গুল্মসকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম।

"চতুর্থ দিনে প্রভু ঈশ্বর আলোক, দিবা এবং নিশি ও ঋতুসকল সৃষ্টি করিলেন; সূর্য্য চন্দ্র এবং তারা সকলকে সৃষ্টি করিলেন, এবং পৃথিবীকে আলোকিত করিবার জন্য, ও দিবা ও নিশিকে শাসন করিবার জন্য তাহাদিগকে আকাশে স্থাপন করিলেন।

"পঞ্চম দিবসে, প্রাণীসকল যাহারা জলে অবস্থান করে, তিমি-মৎস্য ও মুরগী এবং অপর সকল জীবন্ত জিনিস; এবং কহিলেন—'ফলপূর্ণ হও, ও গুণ কর।

"ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর গরু ভেড়া এবং অন্য সকল পশু সৃষ্টি করিলেন—"

প্রফেসার-পত্নী কঠিন স্বরে বললেন—"কোনো সন্দেহ নেই।"

অনুজ্ঞা বল্লে "কেবল গরু ভেড়া ছাড়া আর কিছু কি তিনি সৃষ্টি করেন নি?"

জর্ণালিষ্ট বললে—"হচ্ছে, হচ্ছে—" বলে পড়ে গেল।

"এবং ঈশ্বর বলিলেন, "আমাদিগকে আমাদের প্রতিবিম্ব ও প্রাতকৃতিস্বরূপ মানুষ' সৃষ্টি করিতে দাও; এবং তাহাদিগকে সমুদ্রের মাছ, আকাশের মুবগী, গরু, ভেড়া ও সমুদায় পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতে দাও।'

"এইরূপে ঈশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্বে মানুষ সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতিবিম্বে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। পুরুষ এবং নারী উভয়কেই তিনি সৃষ্টি করিলেন।

অনুজ্ঞা বলে উঠল—"তবে—?"

জর্ণালিষ্ট তার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে পড়ে চলল—

"এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন 'ফলপূর্ণ হও, ও গুণ কর; এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর; এবং পরাজিত কর; এবং সমুদ্রের মাছ, আকাশের মুরগী, এবং পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর উপর আধিপত্য কর।...এবং সকাল ও সন্ধ্যা ষষ্ঠ দিবসে হইল।"

সঙ্গীতবিদ্ বলে উঠল—"প্রীচিং থামাও এইবার, এ যে পাদ্রী সাহেব হয়ে উঠলে—"

অনুজ্ঞা বললে—"বেশ ত হল; এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে কি?"

জর্ণালিষ্ট থামবার পাত্র নয়। "আসছে, আসছে" বলে আবার

সুরু করলে। ডাক্তার একাই দু'কাপ চা শেষ করে একটা সিগার ধরালে। বৈজ্ঞানিক মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে একটা গানের তাল বাজাতে লাগল।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মাটির ধূলা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহার নাসারন্ধ্রে জীবনের নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসিয়া দিলেন, এবং মানুষ জীবন্ত আত্মা হইল।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মানুষকে লইয়া ইডেন-উদ্যানে স্থাপন করিলেন, ইহাকে পোষাক পরাইতে এবং রাখিতে। *

"এবং প্রভু ঈশ্বর বলিলেন—'ইহা ভাল নয় যে মানুষ একা থাকিবে; আমি তাহাকে তাহার জন্য একটি সাহায্যকারিণী তৈয়ার করিব।"

বৈজ্ঞানিক পা ঠোকা থামিয়ে মন দিয়ে শুনছিল। বলে' উঠল—"Splendid!" সঙ্গীত-বিদ্ ভ্রূকুঞ্চিত করলে। জর্ণালিষ্ট গ্রাহ্য না করে পড়ে চলল—

"এবং প্রভু ঈশ্বর আদমের উপর একটি গভীর সুপ্তি আনয়ন করিলেন; এবং সে ঘুমাইল; এবং তিনি তাহার পাঁজরাগুলি হইতে একখানি হাড় খুলিয়া লইলেন, ও মাংস ঢাকিয়া দিলেন।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মানুষ হইতে যে পাঁজরা লইয়াছিলেন, তাহাকে তিনি নারী প্রস্তুত করিলেন, এবং মানুষকে প্রদান করিলেন।

"এবং আদম কহিলেন—'এই এখন আমার অস্থি হইতে অস্থি এবং মাংস হইতে মাংস, তাহাকে woman বলা হইবে; কারণ তাহাকে manএর দেহ হইতে লওয়া হইয়াছে।"

সাহিত্যিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার বলে উঠল—"এতক্ষণ তো চমৎকার সাধু-বাঙলায় বলছিলে; এ দু'টো কথার আর বাঙলা জুটলো না?"

স্বর্ণালিপ্ত প্রফেসারের দিকে তাকাল; এবং দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

স্বর্ণালিপ্ত বললে—"শুনলেন ?"

প্রফেসার-পত্নী ঠোঁট উলটিয়ে বললেন—"সব বাজে।"

স্বর্ণালিপ্ত লাফিয়ে উঠে বললে—"সৃষ্টিতত্ত্ব বাজে ? ভগবানও মানেন না তা' হলে ?"

প্রফেসার-পত্নী থতমত খেয়ে বললেন, "তা কেন ? তবে ঐ মানুষের হাড় নিয়ে মেয়েমানুষ তৈরী, ওকথা আর আজকের যুগে চলবে না। পুরুষ আর মেয়ে দুই ভগবান আলাদা আলাদা সৃষ্টি করেছেন।"

বৈজ্ঞানিক এতক্ষণ একমনে সিগারেট খাচ্ছিল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"ঠিক ! ওটা আন্‌-সায়েন্টিফিকও বটে। মাটির ধূলো দিয়ে যদি ভগবান মানুষ গড়ে থাকতে পেরে থাকেন,—তা হলে মেয়ে গড়বার বেলাতেই তাঁর মাল-মসলার অভাব হল ?—তা' নয়; আসল কথা হচ্চে—"

অনুজা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া কম কথা নয়। প্রফেসার-পত্নী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কারণ মিথ্যে কথা বলতে এবং মুখে মুখে চমৎকার গল্প বানিয়ে বলতে—স্বর্ণালিপ্ত ছাড়া ওর আর জুড়ি নেই। বললেন—"আর আসল কথায় কাজ নেই। মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলবেন তো ?" ডাক্তার বললে "ভয় নেই; আমি আপনার ব্রিফ নিচ্চি।"

বৈজ্ঞানিক বললে—"সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে Genesis যা বলেছে তার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিয়োরি আছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন। মানুষের হাড় থেকে ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি

করলেন,—এ কথা অবৈজ্ঞানিক। জগৎ এবং মানুষ একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করে নিলেও পরের ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই একটু অন্য রকম হয়েছিল। মানুষ-সৃষ্টির পরবর্ত্তী সায়েন্টিফিক এবং র‍্যাশন্যাল কন্সিকোয়েন্স গুলো অনুধাবন করে আমি এই থিয়োরি দাঁড় করিয়েছি। ডাক্তার, ভুল হলে সংশোধন করে দিও।"

প্রফেসার-পত্নী ও অনুজা যুগপৎ ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার বললেন—"নির্ভয়ে থাকুন; আমি আছি।" বৈজ্ঞানিক সুরু করলে—

"আপনারা শুনেছেন, প্রভু ঈশ্বর প্রথম দিনে দিন এবং রাত্রি, দ্বিতীয় দিনে স্বর্গ ও মর্ত্ত, তৃতীয় দিনে সমুদ্র, মাটি গাছ ফল ঘাস এবং গুল্মসকল, চতুর্থ দিনে আলোক, দিবা ও নিশি, ঋতু চন্দ্র সূর্য্য তারা, পঞ্চম দিনে প্রাণীসকল যাহা জলে অবস্থান করে, তিমি-মৎস্য ও মুরগী এবং অপর সকল জীবন্ত জিনিস এবং ষষ্ঠ দিবস গরু ভেড়া এবং অন্য সকল পশু সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ এক কথায় মানুষ ছাড়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সবই তিনি খেটেখুটে ষষ্ঠদিন বেলা নটা দশটার মধ্যে সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। এতে তাঁর বেশ শ্রান্তি হবার কথা। তিনি যে এর পর একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে নদীর ধারে হাত পা মেলে বসেছিলেন,—এ কথায় আশা করি আপনারা আপত্তি করবেন না। সকলেই জানেন এ রকম অবস্থায়—অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করতে বসলে মানুষ lonely feel করে; নিজের মনের মত আর একজন এ রকম সময়ে থাকলে ভালো হয়। এর আগে প্রভু ঈশ্বরের মনে মানুষ সৃষ্টি করবার কোনো রকম স্পষ্ট ইচ্ছা বা ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন একা একা ঠেকাতে, তিনি নদীর পাড়ের নরম মাটি দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিস্বরূপ, এবং নিজের

সমতুল্য মানুষ তৈরী করলেন, এবং তার নাসারন্ধ্রে জীবনের নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসিয়া দিলেন।'

প্রফেসার-পত্নী বললেন, "আপনার বলবার চমৎকার ভঙ্গী ছাড়া—এতে অভিনবত্ব কিছু পাওয়া যাচ্চে না।"

বৈজ্ঞানিক বললে—"But it is more rational. তার পরে শুনুন। প্রভু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর এই প্রথম শিল্পরচনায়—আর্ট মানেই হচ্চে imitative creation—এই শিল্পরচনায় বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিলেন। এই প্রথম শিল্পবস্তুটির প্রতি যে তিনি বিশেষ মমতা বোধ করেছিলেন—তা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আনন্দের আতিশয্যে তিনি মানুষকে সমস্ত পৃথিবী এবং গাছের ফল, আকাশের মুরগী, জলের মাছ, ও জমির ভেড়া প্রভৃতির উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র আধিপত্য করতে দিলেন। অতঃপর সপ্তম দিবসে তিনি তাঁর স্বর্গস্থ বাসভবনে বিশ্রাম করতে গেলেন।

"এ কথা বলবার দরকার নেই যে আসমুদ্র-বিস্তৃত ধরণীর একাধিপত্য লাভকরে মানুষ যথাসাধ্য গর্ব্বিত ও আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পায়নি; কারণ সে শীঘ্রই আবিষ্কার করলে—সম্পত্তি পাওয়া যতটা লোভনীয়—রক্ষা করা ততটা নয়; 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত!' এদিকে ভগবানের প্রতিবিম্বস্বরূপ সে ভগবানের আমীরী মেজাজটি পুরো মাত্রায়ই পেয়েছিল।

অনুজা আর থকতে পারলে না। বললে "ঈশ্বরের আমীরী মেজাজ! নতুন আবিষ্কার বটে!"

বৈজ্ঞানিক বললে—"আবিষ্কার নয়; inference. একজন তালুকদারের চেয়ে একজন জমিদারের চাল বেশী; আবার আমাদের দেশে রাজার চেয়ে মহারাজার মেজাজ চড়া। এইভাবে arithmetical

progression এ ধরলেও শুধু সসাগরা পৃথিবীর নয়—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক—তাঁর মেজাজটা কি পরিমাণ আমীরী হওয়া উচিত হিসেব করে দেখ—"

ডাক্তার ঈজি চেয়ারে চোখ বুজে সিগার টানছিল; বলে উঠল—"হিসেব আমার তেমন আসে না। কিন্তু আমি সেটা অনুভব করতে পারছি—"

প্রফেসার-পত্নী চটে উঠলেন—"এই বুঝি আমার ব্রিফ নেওয়া হয়েছে ?—Hostile counsel !"

ডাক্তার উঠে বসল। বললে—"ওঃ, খেয়াল ছিলনা। আচ্ছা, আর ভুল হবে না।"

"ভুল ধরবার কথা আপনার—সে কথা ভুলে গেলে আমাদের কি ভুল হবে—মনে রাখবেন।"—অনুজা বললে।

বৈজ্ঞানিক বলে চলল—"সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আদি মানুষের মেজাজটি যথেষ্ট আমীরীই হয়েছিল। সে বললে—গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া, নদী থেকে জল আনা, মুরগী ধরে রোষ্ট বানানো—এত হ্যাঙ্গামা আমার পোষাবে না—এই সাফ বলে দিলুম। বলে একটা আপেল গাছের তলায় চুপ চাপ শুয়ে রইল। কেবল খুব খিদে পেলে হাত বাড়িয়ে যে দু' একটা আপেল পাওয়া যায়—তাই কুড়িয়ে খেতে লাগল।

"এদিকে ভগবান মিনিট দশেক (মানুষের হিসাবে সম্ভবতঃ বছর দশেক) বিশ্রাম করেই ভাবলেন, দেখে আসি আমার প্রিয় পুত্র কেমন সুখে কাল কাটাচ্ছে। ইডেন ইদ্যানে পৌছে দেখলেন—মহা বিশৃঙ্খলা বাগান জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, মুরগীগুলো বুনো হয়ে গিয়েছে, এবং গরু ভেড়া সব জংলী হয়ে গিয়েছে। আর মানুষ নির্ব্বিকার চিত্তে

আপেল গাছটির তলায় শুয়ে আছে। এবং প্রভু ঈশ্বর বললেন—হে আমার প্রিয়পুত্র, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো? সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভকরে বেশ আরামে দিন কাটচে তো?

"আর মানুষ বললে—"প্রভু ঈশ্বর, মোটেই নয়। আপনি তো আমার মেজাজ ভালই জানেন। নদী থেকে জল আনা, মুরগী রোষ্ট করা, গরু ভেড়া সামলান, ঘাসের বিছানা করা, ফল ছাড়িয়ে খাওয়া—এসব আমার পোষায় না, এত পরিশ্রম করে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টকর। প্রভু, আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

"ঈশ্বর বললেন—"ঠিক, ঠিক, আমারই গোড়ায় ভুল হয়ে গেছে। তোমায় যে ঠিক আমার মতই মেজাজও দিয়েছি। এত পরিশ্রম করা তোমার পোষাবে কেন? দাঁড়াও, এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

"এই বলে প্রভু ঈশ্বর ধূলো মাটি দিয়ে ঠিক আদমের মত আর একটি মানুষ তৈরী করলেন। এবং খুব খুসী হয়ে বললেন—"এই নাও; ঠিক তোমার মত আর একটি মানুষ। এই মানুষটি তোমার সব কাজ করবে;—তুমি এর প্রভু! এইবার তোফা আরামে দিন কাটাতে পারবে।' এই বলে তিনি তাঁর স্বর্গস্থ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। প্রথম মানুষ খুব খুসী হয়ে ভাবল—'যাক বাঁচা গেল; দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে আর হুকুম চালিয়েই দিন কাটানো যাবে। এই ত জীবন!' কিন্তু সুবিধে হল না।

"প্রথম একটা scheme work করতে গেলে অনেক ভুল ভ্রান্তি গোড়ায় হয়। ঈশ্বরেরও হয়েছিল। তিনি অনভিজ্ঞতার দরুন দ্বিতীয় মানুষটিকেও হুবহু প্রথম মানুষের মতই করেছিলেন; অর্থাৎ তার শরীরে বল, মনে বুদ্ধি আর আমীরী মেজাজ ঠিক প্রথম মানুষের সমান ছিল। আদম যখন এর ওপর প্রভুত্ব চালাতে চাইল, ও তখন

আদমের ওপর মুরুব্বিয়ানা চাল দিতে লাগল; আদম যখন ওকে কাজ করতে হুকুম করলে—ও তখন আদামকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিতে চাইলে; এবং আদম যখন ওকে মুরগীর রোষ্ট বানাতে বললে, ও তখন চিৎ হয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে আপেল কামড়াতে লাগল। ফলে —কি দাঁড়াল তা' আর বলবার প্রয়োজন নেই।

"আগের মত মিনিট দশেক—অর্থাৎ মানুষের হিসাবে বছর দশেক যেতে না যেতেই ঈশ্বর আবার ভাবলেন—'আহা, এইবারে আমার প্রিয়পুত্র নিশ্চয়ই পরম আরামে আছে; একবার দেখে আসা যাক।' এইবলে ঈশ্বর পুনর্ব্বার ইডেন উদ্যানে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, বিপর্য্যয় কাণ্ড! উদ্যানের অর্দ্ধেক গাছ ধ্বংস হয়েছে; বাগান লণ্ডভণ্ড এবং মানুষ দুটি ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহে, গাছের ডাল ও পাথর দিয়ে একটি করে পাহাড় তৈরী করে তার পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে; আর মাঝে মাঝে চকিতে মাথা উঁচু করে অপরের মাথা লক্ষ্য করে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছে। ত্রিসীমানায় একটিও জন্তু জানোয়ার নেই। কেবল মাথার ওপর গোটা কতক শকুন উড়ছে। ঈশ্বর তাদের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই, ঠাই করে একটা পাথর এসে তাঁর হাঁটুতে লাগল। আদম একটা দুইমণ পাথর অতিকষ্টে দু'হাতে তুলে ছুঁড়তে যাচ্ছে, দেখে তিনি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলেন। দু'হাতে দু'জনকে ধরে ধমকে বললেন—'এ কি হচ্ছে? তোমরা দু'জনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে বলে ওকে তৈরী করলাম—আর দশ মিনিট যেতে না যেতেই এই কাণ্ড! ভারী অন্যাই! ভা-রী অন্যাই!!'

"আদম হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—'প্রভু, সর্ব্বনাশ! আপনি আর দু'মিনিট পরে এলে আর আমাকে দেখতে পেতেন না। ও লোকটাকে ঠিক আমার সমান শক্তি ও বুদ্ধি আর আমার মত

মেজাজ দিয়ে আপনি বড়ই ভুল করেছেন। ব্যাটা ঠিক সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ওর ওপর প্রভুত্ব করব কি—ওই আমার ওপর হুকুত চালাতে চায়। প্রভু, এর একটা বিহিত করতে হয়।'

"প্রিয় পুত্রের দুর্দ্দশা দেখে প্রভু ঈশ্বর নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি হাতের উপর চিবুক রেখে রদ্যাঁর ল্য পাঁসিভ মূর্ত্তির মত তের মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তার পরে ডান হাত দিয়ে বাঁহাতে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বললেন—"ঠিক হয়েছে!" তারপরে কাজে লেগে গেলেন। আদম দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

"প্রভু ঈশ্বর প্রথমেই দ্বিতীয় মানুষের গোঁফ দাড়ি নির্ম্মূল করে দিলেন। তারপরে একটি কীনার আর কিছু নরম কর্দ্দম নিয়ে তাকে রিমোল্ড করতে সুরু করলেন। আদম আনন্দের আতিশয্যে চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল,—প্রভু তাকে ছেঁটে কেটে এবং চেঁছে ছুলে অনেকটা ছোট এবং রোগা করে ফেললেন; তারপরে সর্ব্বাঙ্গে নরম কাদার একটা কোটিং লাগিয়ে দিলেন; এবং কিছু কিছু addition-alterationও করলেন। ঠিক তের মিনিট পরে কাজ শেষ করে প্রভু হেসে বললেন—'প্রিয় পুত্র, দেখ কেমন হয়েছে।'

"আদম পুলকিত হয়ে দেখতে লাগিল। প্রভু বললেন; এখন এই মানুষটির আগের থেকে—মানে তোমার থেকে—height ঠিক সাত ইঞ্চি কমিয়ে দিয়েছি; fore arm, biceps, triceps, mastoid, deltoid, rhomboid, pectoral, latissimus dorsi, rectus-abdominus, thigh, calf প্রভৃতি big muscle গুলোর স্থূলতাও পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিয়ে দিলাম। হাড় এত সরু আর ছোট হয়েছে

যে ওপর থেকে বিশেষ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না; এবং ওজনও প্রায় ২৫।৩০ পাউণ্ড কমে গেছে।"

অমুজা চকিতে ডাক্তারের দিকে চাইলে। ডাক্তার নির্ব্বিকার ভাবে ঈজি চেয়ারে শুয়ে পা নাচাচ্ছে।

"প্রভু বললেন—'এখন আকারে ও শক্তিতে সব দিক দিয়েই এ তোমার চেয়ে খাটো হল। তবুও কখনো কখনো তোমাকে দু' এক ঘা দিলেও যাতে তোমার না লাগে, সেইজন্যে এর পেশীগুলো কোমল করে দিয়েছি; আর নরম চর্ব্বি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি; তা' ছাড়া দেখ, দৌড়ে না পালাতে পারে, তাই গতি মন্থর করবার জন্যে জায়গায় জায়গায় additional weightও দিয়ে দিয়েছি,—pelvic mass, bust—"

"আদম তার প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে ভালো করে দেখে নিলে। তারপর বললে— কিন্তু প্রভু, মুখের বড় বড় চুলগুলো ধরে মারবার ভারি সুবিধে ছিল;—এগুলো বাদ দিলে—"

"প্রভু বললেন—'ঠিক, ঠিক, আমার খেয়াল ছিল না;—এই যে—' বলে সেই লম্বা চুলগুলি নিয়ে এই মানুষটির মাথায় এঁটে দিলেন।

"এবার আদম খুসী হয়ে বললে—"Splendid! প্রভু, আর কোন খুঁত নেই। এবং ঈশ্বর নিজের এই আশ্চর্য্য বুদ্ধিতে অতিশয় সন্তুষ্ট বোধ করে স্বর্গ রাজ্যে প্রস্থান করলেন।"

প্রফেসার-পত্নী ব্যঙ্গ করে বললেন—এর পরে নিশ্চয় পরম আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে প্রভুত্ব করে মানুষের সময় কেটেছিল?"

বৈজ্ঞানিক বললে—"তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? এখনও সবটা বলা হয় নি; শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"আবার মিনিট দশেক যেতেই ঈশ্বর ভাবলেন—এইবার একবার

দেখে আসা যাক। ওরা নিশ্চয়ই পরম সুখে আছে। এই বলে প্রভু ইডেন উদ্যানে নেমে এলেন। কিন্তু কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পেলেন—নদীর ধারে গাছতলায় আদম একা বসে আছে; মুখ বিমর্ষ, কপালে চিন্তার রেখা।

"প্রভু সহাস্যে বললেন—হে আমার প্রিয়পুত্র, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?"

"আদম হতাশ কণ্ঠে বললে—হায় প্রভু, আপনার সাধ্যি নয়! গায়ের জোর কমিয়ে দিলে হবে কি, বুদ্ধিতে তো আমার চেয়ে কম যায় না, জব্দ করতে গেলেই নানা রকম ফন্দী খাটিয়ে এড়িয়ে যায়—তার ওপর মেজাজটিও ঠিক আমারই মতন রয়েছে,—আমি যা খেতে চাই ও-ও তাই খাবে—দেখুন কি ভীষণ অন্যায়! আর, আমার জন্যে আপনি অনেক করেছেন, কিন্তু আপনার সব কৌশলই ব্যর্থ হল। এই রকম লোক নিয়ে আমার পোষাবে না—"

"প্রিয় পুত্রের এবম্বিধ অশান্তি দেখে নিরতিশয় ব্যথিত হলেন। যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি একমাত্র প্রিয় পুত্রের সুখ-শান্তি বিধান করতেও অক্ষম হচ্ছেন! প্রভু আবার পূর্ব্ববৎ ঠিক তের মিনিট চিন্তা করলেন। অবশেষে প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। তিনি আদমের কানে কানে চুপি চুপি কি বললেন।

'আদম লাফিয়ে উঠে বললে—"Eureka! প্রভু ঈশ্বর, বিংশ শতাব্দীতে জন্মালে আপনি নিশ্চয় নোবেল প্রাইজ পেতেন।"

"প্রভু সস্নেহে হাস্য করলেন; এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কাজ শেষ করে প্রস্থান করলেন।

"এর পরে ঈভকে বশে রাখতে আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে

হয় নি; এবং সেই থেকেই মেয়ে, পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়েছে।"

বৈজ্ঞানিক চুপ করলে। কিন্তু অনুজা আর থামতে পারল না। বললে—"অহো! চমৎকার!!—তা প্রভুর এই শেষ অপারেশনটি কি?"

বৈজ্ঞানিক বললে—'বিশেষ কিছু নয়; প্রভু ঈভের মাথা থেকে আউন্স চারেক ব্রেন বার করে নিয়েছিলেন মাত্র। অর্থাৎ যে অংশে যুক্তি আর উদ্ভাবনী শক্তি থাকে—"

প্রফেসার-পত্নী আর অনুজা যুগপৎ ডাক্তারের দিকে চাইলেন। ডাক্তার হতাশ ভাবে মাথা নাড়লে।

সাহিত্যিক বললে—"এর পরে প্রভু ঈশ্বর আর তাঁর প্রিয় পুত্রকে দেখতে আসেন নি?

জর্ণালিষ্ট বললে—"একবার এসেছিলেন। আদম তাঁকে ঈভের জিভের তীক্ষ্ণতা কমিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল তিনি রাজী হন নি; তিনি ন্যায়বান কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না।"

অনুজা দস্তুর মত চটেছিল। বললে—"এ সবটাই আপনাদের ষড়যন্ত্র! নইলে সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল এল, ডাক্তার এলেন। এ সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। কেবল আমাদের জব্দ:করবার জন্যে—"

মাস তিনেক একটু বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে প্রফেসারের ওখানে গিয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই। প্রফেসার-পত্নী একা চেয়ারে বসে আছেন। কোলে একটি ক্ষুদ্র মানবক। স্নেহে-আনত শীর্ণ মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ।

———

নূতন যুগের কবি

নূতন যুগের কবি, লইয়ো প্রণাম!
তব নাম
আছে কোথা সংগোপনে, আজি নাহি জানি
তাহে নাই হানি,
যেদিন উদিবে সূর্য্য নবীন দিনের
সঞ্চারিবে নব আশা জীবন-হীনের
ঘোর তূর্য্য-রবে
নিয়ো তবে
আমার বন্দন।

আজি হেথা বাঁধে মোরে সহস্র বন্ধন
ঘেরি' দশ দিক্ হ'তে,
জীবন-যাপন-গ্লানি বহি কোন মতে—
মিথ্যা-ধূলি-সমাচ্ছন্ন বায়ুর মণ্ডলে,
কর্দ্দম-উৎক্ষেপ-ক্লিন্ন পঙ্কিল কোন্দলে,
চিরন্তন যাহা কিছু বাণী
শত দীর্ণ খণ্ডে খণ্ডে হানি'
জীবনের হর্ষ খুঁজি মাংসের কলুষে,
তারি গীতি ঘোষে
আজিকার কবি।

সদ্যঃস্নান-সেক-স্বচ্ছ-বসনার ছবি ;
নির্জ্জন নদীর তটে লোভাতুর ভাষা—
কানে কানে গুঞ্জরিত ভিক্ষুক পিপাসা ;
চলিয়া যাওয়ার পরে উন্মনে চিন্তন ;
চাপা হাস্য নিকুঞ্জের ছায়ে সায়ন্তন !
ধূম্র-ম্লান-আর্দ্র-জীর্ণ-কক্ষতল-বাসী
জঠরাগ্নি-সেক দেওয়া ভালবাসাবাসি
গৃহ-চ্ছাদ-রন্ধ্র-চ্যুত খানিক চন্দ্রিমা ;
—আজিকার সঙ্গীতের এই হ'ল সীমা।

অ-জ্ঞাত গায়ক,
তবে আনো তব গান সুতীক্ষ্ণ সায়ক
দুর্দ্দম নিষ্ঠুর বলে বিদ্ধ করি' পঙ্গুর কামনা,
সরীসৃপ-জিহ্বাবৎ বিলোল-রসনা ;
ধিক্কৃত বিশ্বের
কল্পনাকুহকভোজী উৎসব নিঃস্বের—
তারি 'পরে আনো তব খরতর স্বর।
বিদায়-বিধুর
ব্যথার রাগিণী আর যত আর্ত্ত ধ্বনি,
নপুংসক রিরংসার বিচিত্র কাঁদনি ;
নিঃশেষে মিলাক্,
লভি' তব বাক্।
তোমার লেখনী-মুখ হ'তে
বহে যেন স্রোতে,

তিমির-রেখার সারি—
যে-আঁধার-বারি
ভাসায় আসন বক্ষে চতুর্দ্দশ ভুবনের পোত—
ভাষায় তোমার এনো তারি কান্না বিচিত্র অদ্ভুত—
দোলায়িত লহরে লহরে—
যে-ক্রন্দন ঝরে
আলোকিত ধরণীর বর্ণে গন্ধে গানে
মরণ-নেশায়-মাতা চিরঞ্জীব প্রাণে।
তোমার নূতন ছন্দে সে সুরার সুর
বাজায়ো মধুর।
ক্লৈব্যখিন্ন রূপপায়ী নয়ন-পল্লবে
নিবিড় অঞ্জন যেন লভে
গভীর কালোর,
জ্যোৎস্নার রাতে আর দিবসে আলোর॥

"Yes," said the chairman, sadly, "our temperance meeting last night would have been more successful if the lecturer hadn't been so absent-minded." "What did he do?" he was asked. "He tried to blow some imaginary froth from a glass of water!" was the reply.

ভেন্‌ডেটা

১

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ওলগোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জকুঞ্জর কর পাশাপাশি জমিদার ছিলেন। উভয়ের নামই বিস্ময়-উৎপাদক। আসল কথা, ওলগোবিন্দবাবু ছিলেন ওলাই চণ্ডীর বরপুত্র; এবং কুঞ্জকুঞ্জরবাবু শাক্তভাবাপন্ন বৈষ্ণব-বংশের সন্তান।

চারপুরুষ ধরিয়া দুই বংশে কলহ চলিতেছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কুঞ্জকুঞ্জরের বৃদ্ধ পিতামহ ওলগোবিন্দের বৃদ্ধ পিতামহের পুত্রের (অর্থাৎ পিতামহের) বিবাহে বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া, নববধূ দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—'ছেলের কথা কিছু বলব না, বাপকা বেটা; কিন্তু ভায়া, বৌ হয়েছে যেন মুক্তোর মালা।'

রসিকতাটি বুঝিতে বরপক্ষের একটু দেরী হইয়াছিল, সেই অবকাশে রসিক ব্যক্তিটি নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তারপর হইতেই পুরুষ-পরম্পরায় কলহ চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে, ওলগোবিন্দের সহিত আদালতে ছাড়া কুঞ্জকুঞ্জরের সাক্ষাৎ হইত না—তাহাও কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হইলে, যুযুধান ষণ্ডের মত উভয়ে ঘোর গর্জ্জন করিতেন।

উভয়ের পার্ষদ ও শুভানুধ্যায়ীগণ উভয়কে দূরে দূরে রাখিত।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে?

ওলগোবিন্দ একদা দেওঘরে এক বাড়ী খরিদ করিলেন। বাড়ীর চারিধারে প্রকাণ্ড বাগান—পাঁচিলে ঘেরা। বাগানে ইউকালিপ্টাস, ঝাউ পেঁপে কলা—নানাবিধ গাছ।

ওলগোবিন্দ সপরিবারে একদিন হেমন্তকালে নব-ক্রীত বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারি বাগানের সখ—বাগান দেখিয়া অত্যন্ত হরষিত হইলেন।

পাঁচিলের পরপারে আর একটা বাড়ী; অনুরূপ বাগানযুক্ত। সন্ধ্যাকালে ওলগোবিন্দ দরোয়ান সঙ্গে সেই পাঁচিলের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে পাচিলের ওপারে আর একটি মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

তারপর ওলগোবিন্দ ঘোর গর্জ্জন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে কুঞ্জকুঞ্জর ঘোরতর গর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু মধ্যে পাঁচিলের ব্যবধান—তাই সেযাত্রা শান্তিরক্ষা হইল।

ওলগোবিন্দ নিজের দরোয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, এই বুড্ঢাকো রাস্তামে পাওগে ত টাক ফাটা দেওগে।' বলিয়া ভেঁপু সিংএর হাতে একটি কোদালের বাঁট ধরাইয়া দিলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর নিজের দরোয়ানকে বলিলেন,—মৃদং সিং, ঐ বুড্ঢাকে রাস্তামে দেখোগে ত ভুঁড়ি ফাঁসা দেওগে।' বলিয়া মৃদং সিংএর হাতে একটি ভোঁতা খুরপি ধরাইয়া দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ওলগোবিন্দ নিজের পুত্র প্রিয়গোবিন্দকে বলিলেন,—"কুঞ্জ শালা পাশের বাড়ীতে উঠেছে।' কুঞ্জকুঞ্জর নিজ কন্যা সুধামুখীকে বলিলেন,—'ওলা শালা পাশের বাড়ীতে আড্ডা গেড়েছে।'

২

স্ত্রীজাতির কৌতূহলের ফলে জগতে অসংখ্য অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ী সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল আজ পর্য্যন্ত কেহ রোধ করিতে পারে নাই; বৃথাই অবরোধ-প্রথা, হারেম, ঘোমটা, বোরখার সৃষ্টি হইয়াছে।

ওলগোবিন্দের বাড়ীতে তিনটি স্ত্রীলোক;—ওলগোবিন্দের স্ত্রী ভগিনী ও দুই কন্যা। কন্যা দুটি বিবাহিতা—গিন্নি-বান্নী জাতীয়া। প্রিয়গোবিন্দ তাহাদের কনিষ্ঠ।

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা সুধামুখীই কেবল অনূঢ়া।

দুই পরিবারের একুনে নয়টি স্ত্রীলোকের কৌতূহল একসঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। পাঁচিলের আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুখ চেনাচিনি হইল।

ভামিনী অন্যপক্ষের কর্ত্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন,—'মিন্‌ষের ঝ্যাটার মত গোঁপ দেখলেই ইচ্ছে করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই!'

গৃহিণী সম্বন্ধে বলিলেন,—'মরণ আর কি!'

সুধামুখী সম্বন্ধে বলিলেন,—'বেশ মেয়েটি!'

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণীও মত প্রকাশ করিলেন; ওলগোবিন্দ সম্বন্ধে বলিলেন,—'মিন্‌ষের পেট দেখনা—যেন দশমাস!'

গৃহিণী সম্বন্ধে—'মরণ আর কি!'

প্রিয়গোবিন্দ সম্বন্ধে—'বেশ ছেলেটি!'

তারপর সুগোপনে রমণীদের মধ্যে আলাপ হইয়া গেল। কর্ত্তারা কিছুই জানিলেন না।

কেহ যদি মনে করে, নারীরা স্বামীর শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে—তবে তাহারা কিছুই জানেনা। হিন্দুনারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে গোপনে ভাব করিবার বেলা তাহাদের নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্যই কবি ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—; কি বলিয়াছেন এখন মনে পড়িতেছে না। তবে প্রশংসাসূচক কিছু নয়।

৩

ওদিক কর্ত্তারা পরস্পরকে জব্দ করিবার মৎলব আঁটিতেছেন।

উকিল-মোক্তার হাতের কাছে নাই, তাই মোকদ্দমা বাধাইবার সুবিধা হইল না। উভয়ে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জগতে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়, শত্রুর কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার ধারাও একই প্রকার হইয়া যায়। তাই পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে ওলগোবিন্দ ও কুঞ্জকুঞ্জর একই কালে একই সঙ্কল্পে উপনীত হইলেন।

গাছ!

বাগান নির্ম্মূল করিয়া দাও!

চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় কিন্তু দেখা গেল ওল-গোবিন্দই অগ্রণী। ইহার গুটিকয় কারণ ছিল। প্রথমতঃ ওলগোবিন্দ পুত্রবান—সুতরাং তাঁহার তেজ বেশী। কুঞ্জকুঞ্জর উপর্য্যুপরি পাঁচটি কন্যার পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, ক্রমাগত কন্যা

জমিতে থাকিলে উৎসাহী ব্যক্তিরও কর্ম্মপ্রেরণা কমিয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, ওলগোবিন্দকে শত্রুদলন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সাবালক পুত্র ছিল—কুঞ্জকুঞ্জরের তাহা ছিল না।

ফলে, একদিন গভীররাত্রে ওলগোবিন্দ সাবালক পুত্রের হাতে একটি কাটারি দিয়া বলিলেন,—'ঝাউগাছ গুলো।—একেবারে সাবাড় করে দিবি—একটাও রাখবিনা।'

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাটারি হস্তে প্রস্থান করিল। প্রিয়গোবিন্দকে দেখিলে কাসাবিয়ানকার কথা মনে পড়ে। কর্ত্তব্যে কঠোর! The boy stood on the burning deck।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জকুঞ্জর দেখিলেন, তাঁহার ঝাউগাছগুলি কাতরভাবে কাৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ঝাউয়ের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথায় চুল ছিলনা বলিয়াই কিছু কণ্টকিত হইতে পাইল না।

তিনি চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিতে লাগিলেন।

তারপর দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—'মৃদং সিং, দেখ্‌তা হ্যায়?'

মৃদং সিং বলিল,—'হজুর!'

কুঞ্জকুঞ্জর বলিলেন,—'ঐ বুড্‌ঢা কিয়া।'

'আলবাৎ। বে-শক্‌।'

'হাম্‌ভি বুড্‌ঢাকো দেখ লেঙ্গে!'

মৃদংসিং বলিল,—তাঁবেদার মোজুদ হ্যায়।'

কুঞ্জকুঞ্জর ভাবিলেন, মৃদং সিংকে দিয়াই প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু

কিছুক্ষণ বিবেচনার পর দেখিলেন তাহা উচিত হইবে না। চাকরকে দিয়া বে-আইনী কাজ করানো মানেই সাক্ষীর সৃষ্টি করা। তাহাতে কাজ নাই। যাহা করিবার তিনি নিজেই করিবেন।

গুলগোবিন্দ সে রাত্রি সুখনিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার কদলীকুঞ্জে কুঞ্জকুঞ্জর প্রবেশ করিয়া একেবারে তচ্‌নচ্‌ করিয়া গিয়াছে। কলাগাছগুলি নিতম্বিনীর নিতম্বের মত পাশাপাশি পড়িয়া আছে।

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীজয়দেব কবি এদৃশ্য দেখিলে হয়ত একটা নূতন কাব্য লিখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু গুলগোবিন্দের চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তিনিও চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিলেন।

তারপর বাড়ীর ভিতর হইতে বন্দুক আনিয়া দমাদম্‌ আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জরও হটিবার পাত্র নয়। তিনিও বন্দুক আনিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। হতাহতের সংখ্যা শূন্যই রহিল।

বীরত্ব প্রকাশ শেষ করিয়া দুইজনে আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। ওদিকে স্ত্রীমহলে কি ব্যাপার চলিতেছে কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

৫

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটু ঠাণ্ডা আছে।

কারণ, দুই পক্ষই বন্দুক লইয়া সারারাত বারান্দায় বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে আকাশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন।

কিন্তু দুইপক্ষই সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ওলগোবিন্দের লক্ষ্য কুঞ্জকুঞ্জরের পুষ্পবর্ষী শিউলী গাছটির উপর।

কুঞ্জকুঞ্জরের নজর ওলগোবিন্দের সুন্দর কৃশাঙ্গী তরুণীর মত ইউকালিপ্টাস গাছের উপর।

একদিন ওলগোবিন্দের স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—'কী ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ—মিটিয়ে ফেল। সুধা মেয়েটি চমৎকার—প্রিয়র সঙ্গে—'

ওলগোবিন্দ চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—'খবরদার!'

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণী বলিলেন,—'বুড়োয় বুড়োয় ঝগড়া করতে লজ্জা করেনা—মিটিয়ে ফেল। প্রিয় ছেলেটি চমৎকার—সুধার সঙ্গে—'

কুঞ্জকুঞ্জর গুম্ফ কণ্টকিত করিয়া বলিলেন,—'চোপরও!'

কিন্তু প্রিয়গোবিন্দ এসব কিছুই জানেনা (সুধা জানে।) প্রিয়-গোবিন্দ পিতৃভক্ত যুবক, তার উপর কর্ম্মকুশলী। ওলগোবিন্দ যখন কেবল শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িতে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রিয়গোবিন্দ সেই অবকাশে শিউলী গাছ কাটিবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়গোবিন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার পর কুঞ্জকুঞ্জর আর বন্দুক ছোঁড়েন না। অতএব তিনটার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। প্রিয়গোবিন্দ স্থির করিল, পিতাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে অভিযান করিবে। পিতাকে বলিলে তিনি হয়ত তাহাকে বন্দুকের মুখে যাইতে দিবেন না।

সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। ভো

রাত্রে উঠিয়া প্রিয়গোবিন্দ করাত হাতে লইল; তারপর নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের বাগানে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে ; কেহ কোথাও নাই। প্রিয়গোবিন্দ পা টিপিয়া টিপিয়া শিউলী গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

শিউলী গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—

৬

একটি মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে !

প্রিয়গোবিন্দ পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইবার সুবিধা হইল না। সুধাও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। এবং চিনিতে পারিয়াছিল। প্রিয়গোবিন্দ সুধাকে আগে দেখে নাই।

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উঁকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে ; মেয়েদের সম্বন্ধে কেনো অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাই ?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল ; বলিল,—'কিছু না।'

সুধা বলিল,—'তুমি আমার শিউলী গাছ কাটতে এসেছ !' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—'মানে—এ গাছ কার ?'

'আমার !'

'মানে—তুমি কে ? এ গাছ ত কুঞ্জর বাবুর !'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ ত।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল,—'তোমরা কেন আমাদের ঝাউ গাছ কেটে দিয়েছ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল,—'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা ত আগে কেটেছ!'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলি চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই!

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুল্‌কাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল,—তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল,—'হাঁ—কেন?'

প্রিয়গোবিন্দের কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া বলিল,—তবে আ-আমিও রোজ এ-ই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী!

অন্দরমহলের ষড়্‌যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens!

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্ত্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতদিন পরে দু'জনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিংও ভেঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্ত্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদেব প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলী গাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলী গাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল, ওদিক তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলী গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউকালিপ্টাস্ গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।:

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্‌পেপ-সিয়া রোগী; তিনি বলিলেন,—'এর আর বেশী কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্‌লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

পাঁজি দেখিয়া পুরোহিত বৃক্ষছেদনের উৎকৃষ্ট দিন দেখিয়া দিলেন; এমন সহৃদয় অথচ ধর্ম্মপ্রাণ সহায়ক পাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

স্থির হইল সোমবার রাত্রি একটার সময় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। গুলি গোলা বন্ধ আছে, ওলগোবিন্দটা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমাইতেছে, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন করিবার এই সময়।

৮

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

বিশেষত নারীজাতি একযোট হইয়া যাহাদের পিছনে লাগিয়াছে তাহাদের জয়ের আশা কোথায়?

রাত্রি একটার সময় কুঞ্জকুঞ্জর করাত লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাঁচিল পার হইলেন। কিন্তু ইউকালিপ্টাস গাছের কাছে গিয়া যেমনি দাঁড়াইয়াছেন, অমনি ওলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। কুঞ্জকুঞ্জর করাত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ভেঁপু সিং দরোয়ান তাঁহাকে পিছন হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

এই ভাবে বুকে-পিঠে আলিঙ্গিত হইয়া কুঞ্জকুঞ্জর বাড়ীর মধ্যে নীত হইলেন। তাঁহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য প্রান্ত নিজ হস্তে লইয়া ওলগোবিন্দ আর একটি চেয়ারে বসিলেন। বন্দুক তাঁহার কোলের উপর রহিল।

দুইজনে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলেন।

চারি চক্ষুর ঠোকাঠুকিতে একটা বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেলনা, ইহাই আশ্চর্য্য। ওলগোবিন্দ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—বুদিনানা অফ্ দি ব্রঙ্কাইটিস্ দি ঘুলঘুলি অফ্ দি ইন্টু চাট্নি কাবাব। তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—! গিজিতাকৃশিন্!'—তাঁহার উদর জীবন্ত ফুটবলের মত লাফাইতে

কুঞ্জকুঞ্জর কিছুই বলিলেন না।

ওলগোবিন্দ তখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভেঁপু সিংকে বলিলেন,—প্রিয়কে ডাক !'

প্রিয় আসিল।

ওলগোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—'শিউলী গাছ !'

কাসাবিয়ানকা তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল।

৯

পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ওলগোবিন্দ দুই মিনিট অন্তর ফুটবল নাচাইয়া হাসিতে লাগিলেন,—'হিঃ! হিঃ! হিঃ!'

তারপর ওলগোবিন্দ বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, থানামে খবর দেও! এই চোট্টাকে জেলমে ভেজেঙ্গে !'

'যো হুকুম' বলিয়া ভেঁপু সিং প্রস্থান করিল।

আরো পনের মিনিট অতীত হইল। ওলগোবিন্দ পূর্ব্ববৎ দু' মিনিট অন্তর হাসিতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উভয়ের কর্ণে দূর হইতে একটা শব্দ প্রকাশ করিল—'লু—লু—লু—'

দু'জনে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করিলেন। শব্দটা যেন কুঞ্জকুঞ্জরের বাড়ী হইতে আসিতেছে।

ওলগোবিন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রে ও আবার কিসের শব্দ! শেয়াল নাকি? প্রিয় এতক্ষণ ওখানে কি কি করিতেছে?

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইবারও উপায় নাই—কুঞ্জকুঞ্জর পলাইবে।

এমন সময় ভেঁপু সিং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল; বলিল,—'আয়্ হুজুর, আপ বৈঠা হ্যায়?'

ওলগোবিন্দ রাগিয়া বলিলেন,—'বৈঠা রহেঙ্গে নেইত কি লাফাঙ্গে? ক্যা হুয়া?'

ভেঁপু সিং জানাইল, ও বাড়ীর মাইজী লোগ দাদাবাবুকে পাকড়িয়া লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে!

দুই কর্ত্তা এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। ওলগোবিন্দের কোল হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

ভোঁপু সিং তখনো বার্ত্তা শেষ করে নাই, সাক্ষাতে বলিল সে উক্ত মাইজীলোগ কেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'উল্লু উল্লু' বলিয়া গালি দিতেছে।

এই সময় কর্ত্তারা সকলেই শুনিতে পাইলেন—'উলু—উলু—উলু—'

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর, যেন একই মন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জকুঞ্জরের পায়ের দড়ি অজ্ঞাতসারেই ওলগোবিন্দের হাতে ধরা রহিল।

তাঁহারা যখন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ডিসপেপ্‌সিয়া রোগাক্রান্ত পুরোহিত মহাশয় শুভকর্ম্ম শেষ করিয়াছেন।

দুই বাড়ীর গৃহিণীই উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তাদের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—'আ মরে যাই! বুড়ো মিন্‌ষেদের রকম ত্যাখ না! যেন সঙ্!'

—'চন্দ্রহাস'

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ

এতদিনে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে স্কন্ধে লইয়া বাউল নৃত্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। চণ্ডীদাসী কবচও নাকি বিলি হইবে। চণ্ডীদাস-স্মৃতিরক্ষা সমিতির নিকট আবেদন করিলে এ কবচ পাওয়া যাইবে। এ কবচ একটি সান্যাল মহাশয়কে কিছুদিন পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কল্যাণেই সান্যাল মহাশয় প্রস্থানের পথে রাণীর দেখা পাইয়াছিলেন।

*　　　*　　　*

সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমবাসীর মজিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বাউল সম্প্রদায়ের একটি নৃত্য গত ৭ই পৌষ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে হইয়া গিয়াছে। ভক্ত নাকি অনেক জুটিয়াছিল। গান হইয়াছিল—

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

এবং—হৃদয় আমার নাচেরে।

কিন্তু সেদিন পরলোকতত্ত্বের একটি চক্রে চণ্ডীদাস নাকি আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছেন—এ সুরাপাত্র আমি ওষ্ঠ পর্য্যন্তই—বুঝলে রবি ভায়া?

কারণ পা টলিলে রামী রাগ করিবে।

চণ্ডীদাসের স্মৃতি-রক্ষা অতি উত্তম প্রস্তাব—আর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে যে এক গোল বাধিয়া বসিয়া আছে! বাঁকুড়া হইতে বিদ্যানিধি ও রায় বাহাদুর সাহানা মহাশয় চণ্ডীদাসকে লইয়া এক স্বত্বের মামলা রুজু করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা হুগ্ হইতে নব নানুর পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া

ফেলিয়াছেন। তাঁহারা ইন্‌জাংশন প্রার্থনা করুন। স্বত্ব ত' ভূয়া—বেদখল হইলে স্বত্বের মূল্য শুধু হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখা।

*　　*　　*

বীরভূমের তরফের এ মামলার তদ্বিরকারক সুপণ্ডিত সাহিত্যরত্ন মহাশয় হুঁসিয়ার লোক। তিনি ত' চণ্ডীদাসকে তিন টুকরায় ভাগ করিয়া বসিয়া আছেন—দীন—দ্বিজ—বড়ু। হাত দুইটা—দুই হাতে দুই টুকরা লইয়া গেলেও এক টুকরা পড়িয়া থাকিবে। তাহাতেই মহাপীঠ বানানো চলিবে।

*　　*　　*

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এ বাঁটোয়ারার যুগে টুকরা আরও বাড়ান হউক। বর্ণ ভাগ করিয়া ভাগ করা হউক—অচ্—অণ্ড্—ইদ্—আস। কারণ দুই দিন পরেই মুসলমান ভায়ারা চণ্ডীদাসের ভাগ দাবী করিবেই। তখন তাহারা লইবে অণ্ড—এবং ইদ। অচ্—এবং আস—বীরভূম বাঁকুড়া ভাগ করিয়া লইবে। কোন গোল থাকিবে না।

*　　*　　*

আমরা একটা কথা বলি। সংসারে ব্যাস-কাশী অধিক সৃষ্টি করিয়া লাভ নাই। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান একটা থাকাই ভাল। চণ্ডীদাস বাঙালী—তাঁহার পদাবলী বাঙালী মাথায় করিয়া রাখিলেই তাঁহার সত্যকার স্মৃতি-রক্ষা করা হইবে। তবে তাঁহার জন্মস্থান প্রকৃত কোথায়—সেই সত্য নির্দ্ধারিত হওয়াও প্রয়োজন। তাহাতে বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। এ বিষয়ে বীরভূম বাঁকুড়ায় 'টাগ্ অব ওয়ার' আমরা চাহি না। চাই সত্যের নির্দ্ধারণ।

বীরভূমে—নানুরে এবং কীর্ণাহারে দুইটা ধ্বংস স্তূপ আছে—একটি চণ্ডীদাসের ঢিপি—অপরটি সমাধি বলিয়া খ্যাত। এই দুইটিকে খনন করিয়া দেখিলে হয়ত কাজ হইতে পারে। হয় ত' বাংলা সাহিত্যে নব সম্পদেরও সংস্থান হইতে পারে। সেইটি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পাঁঠা কাটিয়া নাচাই ভাল।

অমৃতং বালভাষিতম্

ছোটো ছেলের কাছে তাহার বাবাই হইলেন সকলের সেরা। কি গায়ের জোরে, কি কলে-কৌশলে আর কেহই তাঁহার মত নয় এই হইল শিশুমনের একান্ত প্রিয় বিশ্বাস; সে বিশ্বাস এত প্রবল যে ছোট ছেলে সময়ে অসময়ে এসম্বন্ধে কিছু বলিয়াও ফেলে। কিন্তু পরিণত বয়সের সাধারণ বুদ্ধির কোন লোকে নিজ পিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভক্তি রাখিলেও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ের জোর বা গুণপণায় বিশ্বাস করে না এবং যদি দৈবাৎ কারো বাপ অন্য দশজনের চেয়ে কোন বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়াও থাকেন, পুত্র বাজারে দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাবাদ করিতে লজ্জা অনুভব করে। তাই ১৩৪২ সালের আশ্বিনের উত্তরায় অতুলপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের সুযোগ লইয়া দিলীপকুমার তাঁহার নিজ পিতার যে উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

* * *

আমাদের হয়ত ভুল হইতেছে।

পিতার প্রতি প্রশংসাবাদটাও হয়ত অতুলপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মত গৌণ। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধের আসল ইঙ্গিত হয়ত এই যে, দেখ আমি শ্রীদিলীপকুমার, সেরা 'সুরকার' ডি. এল. রায়ের পুত্র, তার উপর মিউজিকের ডিপ্লোমা আছে; কাজেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আমিই অদ্বিতীয় সমজদার। জানি না আমাদের এ ধারণা সমূলক কিনা। সমূলক হইলে বলিতে হইবে দিলীপবাবু শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়ে লজ্জাকে সঙ্গের সঙ্গিনী করেন নাই। তাহাতে হয়ত আশ্রমপীড়ার আশঙ্কা ছিল। তাঁহার সমনামী (namesake) দিলীপ-রাজাও বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করার সময়ে নিজের পরিচায়ক ও সৈন্যাদি সঙ্গে লইতে পারেন নাই, পাছে আশ্রম পীড়া হয়।

* * *

আমরা এত দিন জানিতাম রবীন্দ্রনাথই বাঙলার অদ্বিতীয় কবি, কেবল সাহিত্যিকই নন, পরন্তু সঙ্গীতস্রষ্টাও। কিন্তু কল্পিত পিতৃ-গৌরবস্ফীত দিলীপকুমার বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা (তাঁহার ভাষায় সুরকার) দের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা নহেন; শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা মাত্র এক অতুলপ্রসাদ আর অপর ডি, এল, রায়। অতুলপ্রসাদের প্রতি দিলীপবাবু যে সুবিচার করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহারই গুণগান উপলক্ষে নিজ বাপের মহিমা কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যাইতেছে।

* * *

কোন সঙ্গীতজ্ঞ (musical expert) ইতিপূর্ব্বে ডি. এল. রায়কে এত বড় সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, দিলীপবাবুও শুনিয়াছেন

বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা শোনা থাকিলে তিনি পিতার অসাধারণ সঙ্গীত-পারদর্শিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ, মাত্র ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র ও সাহিত্যিক ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের উক্তি উদ্ধৃত করিতেন না।

* * *

শরচ্চন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরী ডি. এল. রায়ের সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা এক মত না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধা পোষণ করি না। যেহেতু নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন কাজেই বিশেষজ্ঞ না হইয়াও ডি. এল. রায়ের সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নহে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ডি. এল. রায়ের সঙ্গীতপ্রতিভা একেবারে তুচ্ছ নহে। কিন্তু গরজের দায়ে অনুরূপ আচরণ করিলেও দিলীপবাবুর কাছে এই শ্রেণীর মতামতের কোন মূল্য নাই এবং এই শ্রেণীর মতকে তিনি বিশেষ তিরস্কার-যোগ্য মনে করেন।

* * *

বাংলা দেশের কোন সঙ্গীতজ্ঞকে প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া দিলীপবাবু স্থনীতি চাটুজ্যেকে অত্যন্ত অশোভন আক্রমণ করিয়াছেন (উত্তরার প্রবন্ধে)। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন—"এই শ্রেণীর অনধিকারীরা সব দেশেই সব তাতেই কথা বলে থাকেন—কোন একটা বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ-করা তকমার জোরে।"

কিন্তু শরচ্চন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী যে কিসের জোরে সঙ্গীতে অধি-কারিত্বের দাবী করিতে পারেন দিলীপবাবুর পিতৃগৌরব তথা আত্ম-গৌরব খ্যাপনের তাড়নায় তাহা ভাবিবার অবকাশ পান নাই। আর

ভাবিয়াও কোন ফল হইত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। দিলীপবাবু যেমন এলোমেলো ভাবে সুনীতি চাটুজ্যেকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে ভাবিতে হয় তিনি বুঝি লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি তর্কেরও মাথা খাইয়া তবে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের যতদূর মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ এই দুইটি জিনিষকে আশ্রমের বাহিরে রাখিবার কোন বিধান করেন নাই।

যাক্, সুনীতি চাটুজ্যের উপর দিলীপবাবু তাঁর ক্রোধের একটা কারণ দেখাইয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন অপরাধে তাঁর অবজ্ঞাভাজন হইলেন তাহা বুঝিতেছি না। ডি. এল. রায়ের আনন্দ বিদায়ের ভূত যে তাঁহার পুত্রের কাঁধেও শওয়ার হইয়াছে একথা আমরা বিশ্বাস করিতে নারাজ। যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তবে কেন তাঁহার প্রতি দিলীপবাবুর বক্রভাব? এ বিষয়ে ভাবিয়া আমরা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। তবে কথা প্রসঙ্গে কোন বন্ধুর কাছ হইতে নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্র-দিলীপ সংবাদের যে কাহিনীটি পাইয়াছি তাহা হয়ত এ সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করিতে পারে।

প্রায় ছয় সাত বৎসর আগে একবার দিলীপবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তখন সেখানে তিনি হার্মোনিয়ম বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথের এবং ডি. এল. রায়ের এবং অন্যান্যদের গান মাঝে মাঝে গাহিয়া আশ্রমের ছাত্রাদি সকলকে শোনাইয়াছিলেন। তাহাতে প্রথম দুই একদিন শ্রোতাদের উৎসাহ বেশ ছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পরে ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। জানিনা এজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁহার গানকে দায়ী করিয়াছিলেন কিনা। দায়ী না করিবারই কথা। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথের

রচিত কোন একটি প্রসিদ্ধ গানে দিলীপবাবু নিজস্ব সুর যোজনা করিয়া গাহিতে চাহিলে রবীন্দ্রনাথ মৃদুভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কবিকে আমরা এ বিষয়ে দোষ দিতে পারি না, কারণ নিজের পাঁঠাকে সকলেই লেজের দিকে কাটিবার স্বাধীনতা রাখে।

* * *

কৌশলে রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে জয়পত্র আদায় করার ফন্দীটা যে ব্যর্থ হইল এজন্য হয়ত দিলীপবাবু কবিকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কারণ ইহার পরে আর তিনি শান্তিনিকেতনে কবি তথা অন্য বাঙালী শ্রোতাদের জন্য কোন গান করেন নাই। তাহার বদলে ছোট মজ্‌লিস্ করিয়া গুজরাতী তামিল তেলেগু আদি অবাঙালী ছাত্রদের নিকটে তাঁহার গীতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রমহলে দিলীপবাবুর গান খুব প্রিয় ছিল। কেনই বা তাহা না হইবে!

বড়ই দুঃখের বিষয় বঙ্গের এই অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞটি বাঙালী শ্রোতার অভাবে কিষ্কিন্ধ্যার ওপারে গিয়া আত্মনির্ব্বাসন করিয়াছেন এবং সঙ্গীতের আলাপ ছাড়িয়া সজ্জননিন্দার প্রসঙ্গে প্রলাপ বকিতেছেন।

* * *

আরও অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একজন বন্ধু হঠাৎ শকুন্তলা খুলিয়া আমাকে শোনাইতে বসিলেন। যখনি শুনিলাম "আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।" তখনি প্রবৃত্তিকে প্রতিসংহার করিলাম। কারণ মৃগ দূরের কথা আমাদের শাস্ত্রে শাখামৃগকেও অবধ্য বলা হইয়াছে।

পেশা পরিবর্ত্তন

অষ্ট্রেলিয়ান্ বুমেরাং ছোঁড়া শিখি,
নবীন লেখক আমি,
রচনা পাঠাই সম্পাদকের কাছে
ফিরে আসে পুনরায়—
বাঁকা বুমেরাং ঠিক।
আবার পাঠাই লেখা
আবার ফিরিয়া আসে,—
হাত পাকিয়াছে বুমেরাং নিক্ষেপে!

পাঠাই কবিতা লিখে—
—প্রেম-পিচ্ছিল চুমু-চট্‌চটে লেখা—
সেও ফিরে চলে আসে
সম্পাদকেরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
গল্প লিখিয়া লালসায় জরজর
লালা-নিষিক্ত পণ্যনারীর জীবনের খুঁটিনাটি—
ভাবি এইবার কাবু করিয়াছি শেষে
নিরেট সম্পাদকে।
সম্পাদকের ঝামা-কর্কশ প্রাণে
গল্পের রস পশেনা একেবারে—
গল্প ফিরিয়া আসে
নীড়-প্রত্যাশী ডানা-ভাঙা পাখী সম।

লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি ;
ওরে ও সম্পাদক,
কিছুতেই তুই ঘায়েল হবিনা কিরে ?
শেষে একদিন নেহাৎ বেজার হয়ে
এগারো ইঞ্চি থান ইট একখানা
নিক্ষেপ করি সম্পাদকের শিরে।

সাবাস ! কম্ম ফতে !
এগারো ইঞ্চি ফিরিয়া আসেনা আর।
এ ত বুমেরাং নয়,
গল্পও নয়—নয় কবিতার খাতা !
একটি ইটের সবেগ সঞ্চালনে
সাবাড় সম্পাদক !

বুঝিয়াছি নিঃষশ
ইট ঢের ভাল গল্প কবিতা হতে।
সাহিত্য সেবা ছেড়ে
ধরিব এবার গুণ্ডামি-করা পেশা—
নাম হবে—কালু সেখ !

—"চন্দ্রহাস"

"দৌড়চ্ছ কেন ?" "দুজন ছেলেকে মারামারির হাত থেকে বাঁচাচ্ছি।" "কোন দুজনকে ?" "আমাকে আর কালুকে।"

দরদী গদা

সে ছিলো এক তরুণ।

ফুলের গন্ধ শুঁকতো আর লিখতো কবিতা।

একদিন সে আন্‌লো একটা গোলাপ ফুল—কোন্‌-এক অনামা তরুণীর বিনামার তীর্থ-রেণুমাখা সে ফুল।...

সাত দিন ধরে সে লিখছে এক করুণ-কাব্য—সেই ফুলে চুমো দিয়ে, বুকের বাঁ-দিকের পঞ্চম পাঁজরে চেপে ধ'রে, নিজের বেদনাশ্রুর ধারায় সঞ্জীবিত রেখে।...

দেখে দেখে গদা তার থাঁদা নাক চুল্‌কাতে লাগল বারবার; 'উপায় কী, উপায়?'

বহুকালের বৃদ্ধ ভৃত্য সে, কবিকে সে ভালোবাসে আপনারই ছেলের মতো—যদিও ছেলে তার নেই একটাও।

মূর্খ সে, তবু তার আছে সহজ-বুদ্ধি, আর এক-কালে তারও ছিল তারুণ্য—দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাতাস ভারী ক'রে তুলতো সে-ও।

সে বুঝলো কবির অভাব!

ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলো সে রুদ্যমান কবির রুক্ষ চুল-ভরা মাথায়, করুণা-সিক্ত কণ্ঠে বললো, 'দুঃখ কোরোনা, খোকাবাবু, আমি এনে দোব।'

কবিরা চমকায় না কখনো; তাই সে ধীরে ধীরে নিজের ঘাড়টা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁয়ে বেঁকিয়ে আপনার চোখ দু'টো গদার মুখের উপর তুলে ধ'রলো, সীমাহীন ব্যথার সাগর দোল খাচ্ছে সেই চোখে!

কবি যেন মাকড়সার জালে ঝঙ্কার তুলে অপূর্ব্ব মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি জানো বাস্তবিকই ?'

গদা মৃদু হাস্য করলো মাত্র—সেই চিরন্তন, মোনালিসা-মার্কা রহস্যময় পেটেণ্ট হাসি !

কবি তা দেখলো, বললো, 'পারবে তুমি। জানি আমি তুমি আমার মরমী বন্ধু, দরদী দাস—ক্ষমা করো যদি তোমার প্রাণে আঘাত লেগে থাকে এ-কথায় !'

আবার হাসলো সে,—ক্ষমাসুন্দর হাসি ! বললো, 'কিছু নাঃ ; তুমি মাঠে একটু ঘুরে এসো, এমন করে থাকলে বাঁচবে না।'

কবি তার দিকে চাইলো করুণ দৃষ্টিতে, বললো, 'সত্যি, সে না এলে বাঁচবো না আমি, অথচ আমার বাঁচা দরকার, আমি বাঁচতে চাই।'

গদা তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচবে, সন্ধ্যার পর এসে দেখবে সব ঠিক।'

কবি হাত চালিয়ে দিলো তার গায়ের সোয়েটারের তলায়, বুকের কাছ থেকে টেনে বার করলো সেই গোলাপ ফুলটি। দুচোখ বুজে পরম আগ্রহে সেটি ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখে দিলো টেবিলের ধারে কানাভাঙা রেকাবিখানার উপরে, মনে মনে বললো, 'দেবী, তুমি এসে দেখো, একটু করুণা কোরো ?''

তারপর তিপ্পান্ন পাতার অসম্পূর্ণ কাব্যখানাকে গুছিয়ে রেখে দিলো তার তলায়। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে গদার হাজাধরা হাত দু'খানা চেপে ধ'রে কণ্ঠে আকুল কাকুতি ফুটিয়ে বললো, 'গদাদাদা, আমার স্বপন সফল করো !'

ধর্ম্মের ষাঁড়ের মতো একান্ত একা এই ছেলেটার এমন মর্ম্ম-ছেঁড়া মিনতি সে আশা করেনি হয়তো ! ঘোলাটে চোখের খিঞ্চি দৃষ্টি

অশ্রুবাষ্পে আরো ঘুলিয়ে গেল, স্নিগ্ধ স্বরে চুণদগ্ধ দাঁত বার ক'রে সে অভয় দিলো, 'কোনো ভাবনা কোরো না, সন্ধ্যায় দেখে নিও।'

* * *

সন্ধ্যার শেষ।

কবির দুটি পায়ে জাগলো কম্পন। পকেট থেকে বার করে নিলো সে তার চিরুণী আর ছোট একটু আর্শী। চুলগুলি আঁচড়িয়ে নিয়ে সে বুকের পকেট থেকে বার করলো একটি শিশি—গন্ধ। ভুরুতে নাকের নীচে চাঁছা-গোঁফ ও হাতের আঙুল-কটির ডগায় গন্ধ মাখালো। শালখানি কাঁধের উপর থেকে টেনে আরেকটু নামিয়ে দিলো হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত লুটিয়ে। তারপর কোঁচাটা ধ'রে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো উপরে।

বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানার পানে চেয়ে কবি ইতস্ততঃ করলো একটু—তারপর নতমস্তকে গিয়ে দাঁড়ালো দরজায়।

বীণাবিনিন্দিত-কণ্ঠে কেউ তাকে অভ্যর্থনা করলো কী?

না।

চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো কবি!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখলো টেবিলের উপরকার রেকাবিতে সেই গোলাপ ফুলটি নেই, তার পরিবর্ত্তে একগাদা গাঁদা ফুল হাতে ক'রে পাশে ঘুমিয়ে আছে দরদী গদা! গদা উদ্দেশ্যের ভারে কাবু, অথচ উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল না। কেবল নাক ডাকছে।

—বি-কু-বড়াল

হনুমানায়ণ

আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটি গণ্ডগ্রামের মধ্যে জনশূন্য আম বাগানের নিকটে আমার তাঁবু পড়িয়াছিল। সেট্‌ল্‌মেণ্ট-এর কার্য্যোপলক্ষে আমাকে সেখানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বড়দিনের ছুটি না পাইয়া হতাশ ভাবে নিজের ডেক্ চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিলাম। দিনের বেলায় লোকজনের হট্টগোলে এবং কুটিল আইনের গোলমালে মাথাটা যে বিশেষ সুস্থ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় যে সব উৎসব সমারোহ হইতেছে, খবরের কাগজে তাহার বিবরণ পড়িয়া মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম ও নিজের অদৃষ্টের অপরিসীম পরিহাসের কথা ভাবিতেছিলাম। সম্মুখের "টিপয়ে"র উপরে রক্ষিত চা কখন যে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, খেয়াল নাই। কুণ্ডলীকৃত ফুৎকারিত, উদ্‌গারিত ধূম্ররাশির স্বচ্ছন্দ বক্রগতি দেখিয়া অঙ্কশাস্ত্রের vortex theoryর যুক্তিতর্ক মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভ আলো তখনো আম গাছ ত্যাগ করে নাই। হঠাৎ একজন কিম্ভূতকিমাকার ভিক্ষুক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ও সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর, আমার একখানা দরখাস্ত আছে। আমি বিরক্ত ভাবে মুখ খিঁচাইয়া বলিলাম, কিসের দরখাস্ত! বে'র হও এখান থেকে। এই চাপ্‌রাশী, ইস্‌কো নিকালো। আমি সেট্‌লমেণ্টএর হাকিম আমার কাছে কেহই চালাকী করিয়া যাইতে পারে না। লোকটার নিশ্চয় কোন কু-মতলব আছে—নচেৎ এমন সময় গোপনে আমার কাছে

দরখাস্ত দিতে আসে! লোকটার গায়ে তালি দেওয়া একটা ছেঁড়া কাঁথার জামা। তালিগুলি আবার নানা রঙের। পরনে কটিবাস—হাতে বাঁকা একটি শেওড়াগাছের লাঠি। চেহারা দেখিয়াই মনে হইল, নিশ্চয় সে একটা চোর, বদমায়েস, দাগী বা গুণ্ডা। কিন্তু আমার হাকিমী তাড়া খাইয়াও লোকটি চুপ করিয়া রহিল, যেন কি একটু ভাবিল ও পরে আস্তে আস্তে বলিল, হুজুর, ভগবান্, আল্লা, বিষ্ণু আপনার মঙ্গল করুন—আমার ওপর "অনুরাগ" করবেন না। আমি ফকির মানুষ—দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি—বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। দোয়া করে' আমার আরজটা শুনুন। তাহার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সত্যই যেন আমার কিছু দয়া হইল। তবু আমি একজন হাকিম, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? উষ্ণ স্বরেই বলিলাম, চট্ চট্ বলে' ফেলো—আমার অত সময় নাই। ফকির দরখাস্ত খানি আমার হাতে দিল। আমি পড়িয়া ফেলিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

হুজুর ধর্ম্মবতার আমার আরজ জানিবেন! আমাদের বাপ ফকির ছিল ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরান করিতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন। আমার এক ভাই আছে—সে বাবু-মানুষ। কোনো দিন ভিক্ষা করে নাই। এখন আমার বাপের যে সব ভিক্ষার যজমান ছিল—সে ভাই আমার কাছে তাহার ভাগ চায়। শুনেছি আপনারা পরচাতে লোকের সব স্বত্ব লিখে দেন। হুজুরের কাছে আমি তাই দরখাস্ত করি যে আমার ভিক্ষাবৃত্তির যে চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে তাহার জন্ত একটা পরচা দিয়া স্বত্ব কায়েম মকৃরর করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়, হুজুরমালীক নিবেদন ইতি।

নিবেদক শ্রীধর্ম্মদাস ফকির

দরখাস্ত খানি তিন-চার বার পড়িলাম ও ফকিরের মুখের দিকে

তাকাইলাম। সে ভিজা বিড়ালটির মত, কাঁদ কাঁদ ভাবে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাকাইলাম ও দরখাস্ত পড়িলাম। সমস্ত প্রজাস্বত্ব আইনটি আমার মুখস্থ। কিন্তু কোন ধারার মধ্যে এই দরখাস্ত খানি পড়িবে তাহাও বুঝিলাম না। অথচ তাহার "ভিক্ষাবৃত্তির চিরস্থায়ী স্বত্ব" যে আছে বা থাকিতে পারে তাহাই বা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? লোকটার উপর রাগ করিতে পারি না, আমারও মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ফকির যেন তাহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, হুজুর, বহুদূরে বাড়ী, সময় মত আসতে পারি নাই। আজ যদি আপনার সময় না হয় আর একদিন আসব। এ কয়দিন গাঁয়েই কাটাবো। আমি বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে, পাঁচ ছয় দিন পরে এসো। ফকির যাওয়ার সময় বলিল, হুজুর বেয়াদবি মাপ করবেন আপনি এখানে একা একা থাকেন—শরীরও আপনার ভাল নয় দেখছি। বাড়ীতে অনেক দিন যান নাই; ছাওয়াল, পোয়াল ত আছে। আপনাকে খুব খাটনি খাটতে হয়। আমি একটা দাওয়াই দিচ্ছি মধ্যে মধ্যে খাবেন বেশ ভাল থাকবেন। কিছু সন্দেহ করবেন না। বুড়ো ফকিরের কথায় বিশ্বাস রাখবেন। সে আমার "টিপয়ের" ওপর একটি কাগজে মোড়ক করা কতকগুলি "পাউডার" রাখিয়া চলিয়া গেল। "ছাওয়াল পোয়াল" ও "শরীর ভাল না"—"বেশী খাটুনি"—এই সব কথা মনে করাইয়া দেওয়াতে আমি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল লক্ষ্য করি নাই। সমস্ত রাত্রি ভাবিলাম—"ভিক্ষাবৃত্তির চিরস্থায়ী স্বত্ব" ইহা কি রকম ও তাহা কি ভাবে পরচাতে লেখা যায়। এ স্বত্ব কি তাহার একার না আরও এমন অনেক দরখাস্ত আসিবে?

পরের দিন স্নানাহার করিয়া আমার আফিসে বসিব এমন সময় আমার পোষা কুকুর "টমি" একটি হনুমানের লেজ কামড়াইয়া ধরিয়াছে দেখিলাম। ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া হনুমানটি ক্ষত লেজ লইয়া আম গাছের একটি উচ্চ শাখায় গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমি "টমি"কে ডাকিয়া আনিলাম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। হনুমানের গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকা দেখিয়া মনে কষ্টও হইল। যথারীতি আফিসে আসিয়া বসিলাম কিন্তু কাজে মন লাগিল না। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে লোকদের বিদায় করিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম ও কুকুরকে ভৎ‍ সনা করিলাম। তাহার দোষে আমাকে grievous hurtএর chargeএ পড়িতে না হয় সেই দুর্ভাবনা হইল। ডেক চেয়ার বাহির করিয়া চা ও সিগারেট পানে সময় অতিবাহিত করিব মনে করিলাম। শরীরটাও যেন একটু খারাপ বোধ হইতে লাগিল। তাকাইয়া দেখি যে আমগাছে আহত হনুমান গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে ও তাহার আশে পাশে তাহার বাপ, মা, ঠাকুর্দ্দা, মাসী, পিসি, ভাই, মামাত পিস্‌তুত ভাই সব ঘিরিয়া বিভিন্ন ডালে বসিয়াছে। কেহ পায়ে হাত বুলাইতেছে, কেহ কলা প্রভৃতি খাওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছে। অপেক্ষাকৃত ছোকরা হনুমান কয়েকটি আমার তাঁবুর কাছে আসিয়া ঘুঁষি পাকাইতেছে ও মুখ ভেংচাইতেছে। হনুমান 'পরিবারের' দুঃখ ও সমবেদনা, সহানুভূতি দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। "বেয়ারা" চা দিয়া গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, ফকির সাহেবের দাওয়াইটা দিব কি? আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম, আচ্ছা, দাও। চায়ের সঙ্গে মিশাইয়া তাহা একটু একটু করিয়া খাইলাম ও খবরের কাগজ উল্টাইতে লাগিলাম। একটি সিগারেট ধরাইলাম। ঔষধ কি ভাবে

খাইতে হইবে তাহা ফকির সাহেব বলেন নাই—আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। চায়ের tannin, theine, প্রভৃতি বিভিন্ন কেমিক্যাল-এর সঙ্গে মিশিয়া ও সিগারেটএর নিকোটিনের সঙ্গে একত্র সে ঔষধ কি রকম কি ক্রিয়া করিল জানি না। কিছুক্ষণ পর আমার যেন চোখ জুড়িয়া আসিতে লাগিল। জোর করিয়া তাহা তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম ও আর এক পেয়ালা কড়া চা পান করিলাম, শরীরে যেন ঘাম ছুটিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, হনুমানদের ভাষা যেন বুঝিতে পারিতেছি। কানে নূতন ধরণের কথাবার্ত্তা প্রবেশ করিল—যথা—

কুচপরোয়া নেই; লেজের জন্য দুঃখ! রক্ত মাংসের লেজ যদি যায় যাক্—আধ্যাত্মিক লেজ গড়িয়ে দেব—সেই অদৃশ্য লেজে তুমি হনুমানকুলের মুখোজ্জ্বল করবে। তা যদি পছন্দ না কর তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেজ আনিয়ে দেব—কত চাই?

ইহার পর যে সব কথা হইল তাহা ভয়ানক। উহারা দল বাঁধিয়া কুকুরকে সাবাড় ত করিবেই, উপরন্তু আমারও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে এরূপ আলোচনা করিল।

উপরোক্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে করিলাম, বাস্তবিকই বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাহাদের ক্ষতিপূরণ দিই। কিন্তু আমি ত হনুমানের ভাষা বলিতে পারি না, কিছু বুঝিতে পারি মাত্র। কি ভাবে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি ও অনুতাপ প্রকাশ করি! আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং জোড় হাত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, একটা গোদা হনুমান আসিয়া আহত হনুমানকে বুকের মধ্যে করিয়া সে গাছ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্য এক গাছে লইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য

হনুমানগুলি তাহার পশ্চাতে গেল। দুইটি বাচ্চা আমার দিকে পুনরায় মুখ ভেংচী করিয়া পালাইল। আমি সিগারেটএর ধোঁয়ার সঙ্গের এই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন পর সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ফিরিতেছি, দূর হইতে দেখিলাম, একদল হনুমান আমার তাঁবু দখল করিয়াছে। একজন আমার চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছে—আর একজন আমার ডেক্ চেয়ারে দোল খাইতেছে—কেহ আমার বিছানাতে লম্বা হইয়াছে। কুকুরটি বাঁধা অবস্থায় ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আমার চাকর লাঠি হস্তে দূর হইতে আস্ফালন করিতেছে। আমি কাছে আসিতেই একটা ছোক্‌রা হনুমান তড়াক্ করিয়া লাফাইল ও আমার মাথা হইতে টুপী লইয়া মাথায় দিয়া ছুটিয়া মজা দেখিতে লাগিল।

হায় আমার হাকিমত্বের গর্ব্ব ও আস্ফালন! বন্দুকটি তাঁবুর মধ্যে আছে—তাহা আনিতেও পারিলাম না। লোকজন ডাকিয়া আনিলাম ও Phalanx attack করিব পরামর্শ করিলাম। ইতিমধ্যে একটা গোদা হনুমান লাফাইয়া, একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় আমার গালে বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম ও দুই তিন বার গড়াগড়ি করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া দেখি ফকির সাহেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সে গোদা হনুমানের কান মলিয়া দিতেছে ও আমার নিকট ধরিয়া আনিতেছে। তাহার হুকুমে ছোক্‌রা হনুমানটি আমার টুপী যথাস্থানে রাখিয়া গেল। অন্যান্য সকলে আমগাছে আশ্রয় লইল—শুধু লেজকাটা হনুমানটি আমার দিকে ভেংচা ও ঘুঁষি দেখাইল। ফকির সাহেব গোদাকে আনিয়া বলিল, হুজুর, এ বেয়াদব আপনাকে যেরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা করেছে তার শাস্তি আপনি নিজেই দিন। এ বেটা বড় বেয়াড়া। আমি তাকাইয়া দেখিলাম গোদা হাত যোড়

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দুই চোখে জল ঝরিতেছে। আমি তাহাকে বেত মারিব মনে করিলাম ও বেত আনিতে গেলাম। কিন্তু মনে হইল, আমাকে ত আরও কিছুদিন ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে হইবে—রাগাইয়া দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না—বরঞ্চ বন্ধুত্ব করা ভাল।

রাজকার্য্যে এতদিন থাকিয়া রাষ্ট্রনীতি কিছু কিছু বুঝিয়াছি—কাজেই ফকির সাহেবকে বলিলাম, ফকির সাহেব, দোষ আমারই বেশী—কারণ আমার কুকুর একটা হনুমানের অঙ্গহানি করে greivous hurt করেছে, আমি শাস্তি দিতে চাই না। আপনি যাহা হয় ব্যবস্থা করুন। কিন্তু একটা কথা—আপনি এদের বশ করলেন কি ভাবে ?

ফকির সাহেব হাসিয়া বলিলেন, হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে এদের সঙ্গে বসবাস করি—আমার পিতা ইহাদের আদর করত ও খেতে দিত। ক্রমে এদের ওপর আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয়। ক্রমে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলি। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—এদের ভাষা আপনার ঔষধের গুণে কিছু কিছু বুঝতে পারি—কিন্তু বলতে পারি না। আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন ? লক্ষ্য করিলাম, গোদা আমার কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতেছে, আমাকে মারবেন না—আমি ক্ষমা চাই—আপনার যথেষ্ট উপকার করব—আমি মাপ চাই। ফকির সাহেব গোদাকে ডাক দিলেন ও তাহার কানে কানে কি যেন বলিলেন। গোদা আমার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিল ও ফকির সাহেবকে ইসারা করিল। তাহারা অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া গেল। আমি তাঁবুর মধ্যে ঢুকিতেই দেখি টেবিলের ওপর আমার যে writing pad ছিল তাহাতে হনুমানী ভাষাতে কতকগুলি আঁচড় টানা আছে।

হাত মুখ ধুইয়া চুল ব্রাশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ডেক্ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলাম ও হনুমানদের এই ধৃষ্টতার প্রতিশোধ কি ভাবে লওয়া যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন আর অন্য কোন কাজ করিতে পারিলাম না। সান্ধ্যভ্রমণের পর আসিয়া দেখিলাম, গোদা আমার টেবিলের উপর একটি পেয়ারা রাখিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে নখ দ্বারা কত কি যেন লেখা রহিয়াছে। কৌতূহলবশতঃ তাহা তুলিয়া লইয়া খাইলাম—অতি মনোরম ও সুস্বাদু বোধ হইল। সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; আমার যেন কোন দিন কোন রোগ হয় নাই—হইতেও পারে না। মনের স্ফূর্তিতে শিস্ দিতে লাগিলাম ও নিজের খেয়ালে গান ধরিলাম। হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া দেখি গোদা তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে সে অভিবাদন করিল ও বলিল, প্রাতঃপ্রণাম—কেমন আছেন? আমার মুখ হইতে হনুমানী ভাষায় প্রত্যুত্তর বাহির হইল, কি, তুমি এত সকালে এসেছ? আমি বেশ মনের আরামে ঘুমিয়েছি—আজ বেশ ভালই বোধ হচ্ছে। গোদা বলিল, কাল আপনাকে পেয়ারা খেতে দিয়ে মনে ভয় হয়েছিল—আপনি মানুষ, আমাদের খাদ্য খেয়ে পাছে আপনি পাগল হয়ে যান—সে ভয়ে সারা রাত্রি ঘুমোতে পারি নি। আমি বলিলাম, না সে ভয় নাই। বরঞ্চ ভাল ফলই হয়েছে।

আমি তাহাকে তাঁবুর কাছে আসিতে বলিলাম ও একটি প্যাকিং বাক্সের উপর বসিতে দিলাম। বেয়ারাকে চা ও বিস্কুট আনিতে বলিলাম ও তাহার সঙ্গে গল্প গুজব করিতে লাগিলাম। বেয়ারা ইঙ্গিত মত সব কাজ করিল। কিন্তু গোদাকে চা বিস্কুট দিতে রাজী হইল না। আমি চা ঢালিয়া তাহাকে দিলাম। গোদা

বলিল, "অত গরম জিনিষ খাওয়া ত আমাদের অভ্যাস নাই। ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন ত খেতে পারি। আমি বলিলাম চা গরম গরম sip করে খেতে হয়, একটু খেয়েই দেখ। আমি যেরূপ ভাবে চা খাইলাম সেও তাহা অনুকরণ করিল। চা পান ও বিস্কুট ভক্ষণ শেষ হইলে আমি তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল আমার writing padএ কি লিখে গিয়েছ? আমার কাছে হনুমানী ভাষায় মধ্যে ইংরেজী কথা শুনিয়া গোদা তীব্র বক্র দৃষ্টি করিয়া বলিল, আপনাদের দোষই এই যে সোজা ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না—ইংরেজি কথা না দিলেই চলে না? আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, (হনুমানী ভাষায় ও হনুমানী উচ্চারণে) ইংরেজি এবং বাংলা মিশিয়ে talk করাটা আমি ও একেবারেই পছন্দ করি না—তবে কি জান ইংরেজি হচ্ছে আমাদের court language, না বললে আমাদের প্রেসটিজ্ থাকে না। বাংলা ভাষাটা বড় একঘেয়ে নোংরা—ওতে লোককে ধমক দেওয়ার ও chastise করার কোন শব্দই নাই।

গোদা writing padটি হাতে লইল ও অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, আপনার গুষ্টির মাথা! কি চমৎকার ভাষাই আমাকে শোনালেন? বরঞ্চ যদি "উর্দ্দোকৃত" কিছু বলতেন তবু বুঝিতাম। আমি তাহার কথাটা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, তোমরা কি উর্দ্দোকৃত ভাষা ব্যবহার কর না কি? তবেনা বলছিলে তোমাদের হনুমানী ভাষা এত সুন্দর মোলায়েম ও perfect? গোদা বলিল, কি করি বলুন, সেদিন একটি গাছ হইতে শুনলাম, একটা ছোট ছেলে পড়ছে—জিয়াফত খাইতে গিয়া দেখি, খ্যান্ বুটুষ সব তখনও জমায়েৎ হয় নাই। উজু করিতে তালাবে যাইয়া দেখি, তাহার পানি কি ঠাণ্ডা এ ভাষা শুনে অনেকক্ষণ ভাবলাম বাংলা ভাষা তো

কিছু বুঝি—কিন্তু এ আবার নূতন কি ভাষা এরা শিখছে। ফকির সাহেবকে খুঁজে বের কবলাম ও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বোঝালেন এই মানুষ গুলো নূতন একটা ভাষা সৃষ্টি করেছে। সেই থেকে আপনাদের উপর আমাদেব অত্যন্ত ঘৃণা হল। পাছে আমাদের হনুমানী ভাষাও নষ্ট হয় তাব জন্য আমবা একটা মহতী সভা করব মন্তব্য করলাম। আমি গোদাব কথাতে মোহিত হইয়া গেলাম। তাহাদের ভাষা লইয়াও তবে মহতী সভা হয়! আমি বলিলাম তুমি বিকালের দিকে একবার এসো—তোমাদের সাহিত্যের কথা শুনব। গোদা সে writing padটি হাতে কবিয়া বলিল, আমার এ দরখাস্তখানা আপনি নেবেন না? আমি বললাম, তুমি পড আমি শুনি, যদি উপযুক্ত মনে করি নিশ্চয় মঞ্জুব কবব। গোদা পডিতে লাগিল, (হনুমানী ভাষায় লেখা—অনুবাদ কবা হইল)।

ধর্ম্মাবতার,

অধীনের নিবেদন এই যে, হুজুর সকলের প্রজাস্বত্ব লিখিয়া পরচা দিয়া তাহাদেব স্বার্থ চিরস্থায়ী কবিয়া দিতেছেন। আমি দিগ্‌বিদিক্ দলের অধিপতি—আমাদের যে ফলকব বনকর স্বত্ব আছে তাহার জন্য লিখিত পরচা দরকার—কারণ আমাদেব পূর্ব্বপুরুষ খট্‌খটি বংশের অধস্তন বংশধবগণ, তাহারা আমাদের অধিকৃত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে বড় গোলমাল সৃষ্টি করে। পবচা থাকিলে তাহা দেখাইয়া তাহাদের শাসন করিতে পারিব। হুজুরের আদেশে আমাদের "স্বাধীন ভোগ করার স্বত্ব" লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—"

(আগামী বারে সমাপ্য)

কে-ডী-বী

সংবাদ-সাহিত্য

প্রবাসীর বিশেষ নৃত্য সংখ্যাটি দেখিয়া পুলকিত হইলাম। গত আশ্বিন সংখ্যা হইতেই কতকগুলি নারী মলাটের উপরে নাচিতে সুরু করিয়াছিল—পৌষ সংখ্যায় তাহারা দলে ভারি হওয়াতে ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম ছবি উর্ব্বশীর নৃত্য। জাদুকর গণপতির তাসের ম্যাজিকের মত উর্ব্বশী কতকগুলি শাদা ফুল লইয়া ম্যাজিক দেখাইতেছে, এবং উক্ত দলের নর্ত্তকীর মত বলের উপর নাচিতেছে। ৩২৩ পৃষ্ঠার লেজুড়-ছবিতে একটি গাভী খাল পার হইতেছে—পশ্চাতে এক যুবক ও যুবতী দাঁড়াইয়া—যুবক বাঁশী বাজাইতেছে। সম্ভবত খাল পার হইয়া সেও নাচিবে। ইহার পরেই নৃত্য-ধর্ম্ম। উদয়শঙ্কর ও সিমকি, উদয়শঙ্কর ও কনকলতা, এবং সদলবলে উদয়শঙ্কর। প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—"ভারতবর্ষে "দেবগণ হইতে এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন।" আমাদের বিশ্বাস ছিল, দেবগণ হইতে যাহার আরম্ভ ঠাকুরগণে আসিয়াই তাহার শেষ হইবে, কিন্তু আমাদের ধারণা ঠিক নহে। প্রবাসীতে ছবি ছাপাইবার জন্য বাঙালীর আরো কিছুকাল নাচিবার আবশ্যকতা আছে। দেবনৃত্য এদেশে এতকাল অপদেবতাতেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঠাকুরগণ পুনরায় তাহা দেব-শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেওয়ায় আমাদের সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীর শিক্ষামত থিয়েটার দেখা বন্ধ করিব ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু নটরাজ প্রলয়-নাচন নাচিবার পর সকল বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে, এখন হয়ত প্রবাসীকেই

নৃত্যের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হইবে।

—

প্রবাসীর ৪২৭ পৃষ্ঠায় আরো দুইটি নৃত্যের ছবি। ইহা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-নৃত্য। দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল। বাংলা দেশের সকল যুবক-যুবতী যদি এইভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশ যে অচিরাৎ স্বর্গে পরিণত হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। নৃত্য ছাড়া আরো একটি বিষয় আছে। এদেশে মদ্যপানও দেবগণ হইতে প্রথম প্রচলিত হইয়াছে। দেবগণ সুরাপান প্রচলন করেন বলিয়া ইহার ব্যাপক পুনরুজ্জীবন বাঞ্ছনীয়। মদ্যপানবিষয়ে হিন্দুর বিশেষ রীতিনীতি কি, কিরূপ পাত্রে, কি পরিমান মদ্য পান করা উচিত, মাতাল হইলে কতবার বমি করতে হইবে, মাতাল না হইলে প্রায়শ্চিত্ত কি, মাতাল বলিতে কি বুঝায়, হিন্দু মাতালের বৈশিষ্ট্য কি, এবিষয়ে গবেষণা হইলে দেশের সংস্কৃতি আর এক ধাপ অগ্রসর হইবে।

—

পৌষের বিচিত্রায় শ্রীমতী মালতীশ্যাম দেবী নামক লেখিকা নারী-নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—

> আধুনিক শিক্ষায় নারীজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি নারী-নৃত্য এই আধুনিক শিক্ষিত নারীগণ ক্রমশ গ্রহণ করিতেছেন। এতকাল নারীর হিতচিন্তা পুরুষজাতি করিয়াছেন কিন্তু এখন নারী-সমাজের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে আত্মমর্য্যাদা-ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।...পুরুষের সমর্থন পাইয়া

> সমাজের বাহিরে কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে নৃত্য নারীকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহা সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে।...নারী-নৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা সমাজের কাম-প্রবণতার কতকটা অন্তত পশম (উ-?) হয় ইহা মনো-বিজ্ঞান সম্মত কথা। মনের মধ্যে কামকে চালিত করিয়া তাহার ঊর্দ্ধগতি দিতে পারিলে নারীজীবনের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে। যে গণিকাবৃত্তি নারীজাতির অমর্য্যাদার চরম দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে সমাজের কামকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে এই হীনতা হইতে মুক্তি নাই।

লেখিকার উদ্দেশ্য ভাল। যে নৃত্য দেখিতে ভদ্রলোকেরা গণিকালয়ে যান, সেই নৃত্য যদি গণিকাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সমাজে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নারীসমাজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে, কামও ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে গণিকালয়ের নৃত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজের নারী-নৃত্য নাও জিতিতে পারে; আত্মরক্ষা-ধর্ম্মে গণিকারাই অধিকতর নিপুণতা দেখাইবে এইরূপ মনে হয়। আপাতত neutratizalion-ব্যাপারটি নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলাফল দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

—

এদিকে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে সৃষ্টি লোপ পাইবে—অসহ ছাড়িয়া লোকে এরূপ উগ্র সহযোগিতা আরম্ভ করিবে যদ্দ্বারা

স্থান কাল পাত্র কিছুই জ্ঞান থাকিবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন—

> সহ-শিক্ষার সাহায্যে সেক্স-রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটাও অনেকটা বন্ধ করা সম্ভব। ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে স্কুলে সময় কাটাইলে অজানিতে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিতে পারে।

বাপ! একে মনে মনে, তাহাতে আবার স্কুলের ছেলে মেয়ে! রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটা তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয় এককালে খুবই ভোগ করিয়াছেন দেখিতেছি। দেখিতেছি বটে, কিন্তু রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

—

বিচিত্রায় স্রোতের ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছেন শ্রীমতী পুর্ণশশী দেবী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলের কোন্ অংশের জন্য কাহাকে ধন্যবাদ দিব ভাবিয়া পাইতেছি না। সবিতা পাশের বাড়ির অলকের প্রেমে পড়িল, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে অবিবাহিতা মাতার কন্যারূপে পরিচিত করাইয়া লেখক-লেখিকা বোধ হয় সামাজিক বিবেক বাঁচাইয়াছেন।

> মনে পড়ে তার একটি দিনের কথা…
>
> …শিউরে ওঠে, আবার তারই বিভোরে মগ্ন হয়ে যায়…
>
> আনন্দের স্রোত বয়ে যায় তার মরমের ভেতর দিয়ে।

নায়িকা নায়কের "বিভোরে" মগ্ন হয়। এই মগ্নামগ্নির ব্যাপারে হাতযশ কাহার? লেখিকার, লেখকের না বিচিত্রা-সম্পাদকের?

কিন্তু ভাষা শেষ পর্য্যন্ত মগ্নে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই, ডুবিয়াছে।

> নিজের জন্য নয়, সে তো ডুবেইছে…এই বিষম ঘর্ণাবর্ত্তে শুধু হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে—জেনেও…এখন এই ডোবাতেই সুখ যে তার!…
>
> রবিবাবুর 'হৃদয় যমুনা'র মত লাজ ভয় মান অপমান সব ত্যাগ করেই সে ঝাঁপ দিয়েছে—এই দুকূলপ্লাবী ভরা যমুনার উচ্ছ্বসিত ফেনিল স্রোতে—তার নিতল তলে তলিয়ে যেতে—কিন্তু…
>
> ওর সঙ্গে সঙ্গে অলক ডোবে কেন?

হাজার দশেক ফুটকি ও ড্যাশ যুক্ত করিয়া লেখক-লেখিকা বহু প্রকাব ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন। ফুটকি ইঙ্গিতাত্মক নহে, সব কথা খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াই ফুটকি বসান হইয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে এক পাল শূকর ফাঁকা জমি গুলি খুঁড়িয়া গিয়াছে।

অথবা যেন Electro-cardiographএর ছবি দেখিতেছি। কাগজের উপর হৃৎপিণ্ড তাহার ভাষা লিখিয়া গিয়াছে—ফুটকির ভাষা।

> —ওঃ! ঢের ভেবেছি সবি! আর আমি পারি না… ভাববার, বোঝবার শক্তি আমার লোপ হয়ে গেছে। এবার সত্যি আমি পাগল হয়েছি! তুমি আমাকে নাও…আমি আর…
>
> প্রমত্ত হিয়ার উচ্ছল (?) আবেগে অলক সবিতাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় সবলে…বাধা দিতে বৃথাই প্রয়াস

> পায় সবিতা···পাতলা ঠোঁট দুখানির আকুল কাঁপন তার থেমে যায় অলকের আতপ্ত অধরের চাপে···শুধু দেহেই নয় অন্তরেও তীব্র শিহরণ অনুভব করে সবিতা—সেই প্রথম দিনের মত···আজও তেমনি···না, তার চেয়েও নিবিড় অন্ধকার; তখন একটু আলোর আভাস ছিল যেন···এখন অতল···অশেষ···

আমাদের ভুল হইয়াছিল; Cardiograph নহে, Seismograph! "আকুল কাঁপন" ভূমিকম্প ছাড়া হয় না।

—

বিচিত্রার হিমাচ্ছন্ন ছবিখানিতে একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোরী হঠাৎ পদ্মদীঘির ধারে পড়িয়া আছে কেন বুঝা যায় না। স্ত্রীলোকটি রয়াল বেঙ্গল টাইগারের হরিণশিকার-ভঙ্গিতে মেয়েটির ঘাড়ে টপকাইয়া পড়িয়াছে। অনৈকা বৃদ্ধা একখানি রামপুরী চাদর দিয়া উহাদিগকে ঢাকিয়া দিতেছে। খুব সম্ভব, মাতা-কন্যার সহমরণের ছবি, কিন্তু এরূপ স্থানে কেন মৃত্যু হইয়াছে তাহা স্বয়ং চিত্রকরও বলিতে পারিবেন না, কেননা মৃত্যুর উপরে কাহারও হাত নাই। মাতা ও কন্যার ছবিতে sex appeal বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেজন্য চিত্রকরকে ধন্যবাদ।

—

সাঁতারু শান্তিপাল বিচিত্রায় সাঁতার সম্বন্ধে যে উপদেশাদি দিয়াছেন তাহা পালন করা যে বিশেষ সুসাধ্য নহে তাহাই মনে হইতেছে। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন—

> (সাঁতার অবস্থায়) নিদ্রার বেগ আসিলে কফি কিংবা

কোকেন দিবে। অন্যান্য সময় সাঁতারুর পছন্দ অনুযায়ী তালিকা-অন্তর্গত দ্রব্যগুলি দিবে।

মনে করিয়াছিলাম সাঁতার শিখিব, কিন্তু সদিচ্ছা ত্যাগ করিলাম। পূর্ণজ্ঞান থাকা সময়ে ইচ্ছামত খাদ্য পাইব অথচ ঘুম পাইলেই কোকেন, ইহা বড় ভয়ানক। কোকেন কোথায় কিরূপ ভাবে কিনিতে হইবে, তাহা জানিতে হইলে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে?

—

ছন্দের গঠন লইয়া বিচিত্রার বিতর্কিকা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এরূপ তর্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তার্কিকদের কান ঠিক আছে কিনা ইহা নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। এমন কি তাঁহাদের কানের ফোটোগ্রাফও লেখার সঙ্গে মুদ্রিত হইলে ভাল হয়। একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে অনেকগুলি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ইহাতে "প্রচলিত ছন্দরীতি" লঙ্ঘিত হইয়াছে। "প্রচলিত ছন্দ" কি? রবীন্দ্রনাথ যখন সোনার তরী, ছবি ও গান প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন তখন কি ছন্দ প্রচলিত ছিল? যদি সোনার তরী বা ছবি ও গানের কোনো কবিতা প্রচলিত ছন্দোরীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই লঙ্ঘনে নূতন ছন্দোরীতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এরূপ না হইয়া কোনো কবিতার ভিতরকার একটি কি দুইটি ছত্র "প্রচলিত" ছন্দোরীতি লঙ্ঘন করিল কি উপায়ে?

(১) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বর্ষার মত।

(২) যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।

(৩) মণি কেঁদে বলে তবে
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা ?

(৪) 'বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে '
পাস্তি ঘাটায়।

(৫) রাঙা রাঙা অধর ছুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো
করতলে সকরুণ মুখ

(৬) তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জ্জনা দূরে দূর হয়ে যাক।

* * *

(৭) রসের আবেশ-রাশি শুষ্ক করি দাও আসি
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।

(৮) দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় (ইত্যাদি)

এক "মাভৈঃ বাজে নৈরাশ্য নিশীথে" প্রচলিত ছন্দোরীতি নহে, ছন্দোরীতিই লঙ্ঘন করিয়াছে—তাহা ছাড়া উপরে উদ্ধৃত কোনোটাই কোনো রীতি লঙ্ঘন করে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোরীতি উহার প্রত্যেকটিতেই বজায় আছে। কিন্তু একজন বলিতেছেন ইহা "প্রচলিত ছন্দ-রীতি" লঙ্ঘন করিয়াছে—অপর জন বলিতেছেন, এগুলি ত রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বা অতি-পরিণত বয়সের রচনা, সেইজন্য ইহার ছন্দ ঠিক নাই—যৌবনের রচনার ছন্দ ঠিক আছে। আমরা উভয় মহাত্মাকেই নমস্কার করিতেছি।

—

অনৈক রোগী বহুকাল না খাইয়া খাইয়া এত লোভী হইয়া পড়িয়াছিল যে সারাদিন তাহার নিকট কেহ ভাল ভাল খাবারের

গল্প না করিলে তাহার চলিত না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিত। চিৎপুরের বাবুদেরও অনেকটা সেই ব্যাপার দেখিতেছি। কাপ্তেনীসুলভ ভাষায় যে লোলুপ হ্যাংলামির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ও-পাড়ার উপযুক্তই হইয়াছে।

—

কাপ্তেনবাবুরা ডজন ডজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে হোটেলে, রেস্তরায়, গাড়িতে, মদ খান, কথায় কথায় রোল্‌স্‌রয়েস চড়েন, মিঃ সেনের অনুপস্থিতিতে মিসেস্ সেনকে লইয়া ভাগেন—

পড়েছে তো প্রেমে ওমোলা গুপ্তা
যাকে পারে নাই কেও
আমার ব্রাফের সাইড কারেতে
বেড়িয়ে এসেছে সেও।

কেহই না কি বাদ যায় নাই।

—

কাপ্তেন বাবু বলিতেছেন—

মেয়েদের পিছু ছুটিয়াছি আমি
সারাটা জীবন ভোর
একটার পর একটা এসেছে
এমনি ভাগ্য মোর।
ফুরিয়ে গেল না—

ফুরাইবে কেমন করিয়া? তুমিও কেবল দুধ ছাড়িয়াছ, চিৎপুর রোডও একটুখানি নহে।

—

"জোড়াসাঁকো" নামটি রবীন্দ্রনাথেই শেষ হইল। সুভগ চিৎপুরেরই সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে। যুগবিভাগও দুই নামেই করা যাইবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, ঠাকুর-পরিবারে যত কামনা-বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে তাহার সবগুলি ক্ষুধিত পাষাণের মত একত্র আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়াছে সুভগের মধ্যে। কিন্তু হায়! এমন মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তি ধরিল যখন এক গলাবাজি করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না!

—

রবীন্দ্রনাথের মুখোস।

তাই বলি আজ যে মানুষ চেঁচাচ্ছে "রিলিজান অব ম্যান" বলে, "মহামানবের সাগরতীরে" যে মানুষ মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে—এগুলো মুখোস ভিন্ন আর কি?

—

(গান্ধির?) কারিকুরি করা কাপড়।

মানুষের মৌখিক স্বার্থত্যাগের, তার অহিংসা আন্দোলনের, ধর্ম্মের আর নীতি কথার কারিকুরিকরা কাপড়খানা খুলে যদি তাকে নগ্ন করে দেওয়া যায়,—তবেই ত সটাং আমরা সন্ধান পেতে পারি মানুষের সাথে সত্যের সম্বন্ধ কতখানি।

—

আমি না আমার যৌবন।

ওকি আপনি এখানে কি চান—অ্যানি বিছানায় উঠে বসল।

গোবর্দ্ধন দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি? আমি কিছু চাইনা আমার যৌবন চায় তোমাকে, বলেই গোবর্দ্ধন অ্যানির বিছানায় একপ্রান্তে বসে পড়লো।

আপনি জানেন এর ফল কি হবে? অ্যানি দাঁতের সঙ্গে দাঁতের বাজনা বাজিয়ে উঠল।

* * অ্যানি! অনেক লাঞ্ছনা তোমাদের গোবর মাষ্টার সহ্য করেছে—কিন্তু তার যৌবন তা' করতে শেখেনি।

"দেশ"—(পুস্তক পরিচয়)

"এত অল্প দামে যে কি করিয়া এরূপ সুন্দর কাগজ বাহির করা যায়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।"

আশা করি দেশ আর বিস্মিত না হইয়া এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লইবেন।

—

দেশের দুইটি হেড-লাইন ও লেখক—

"কৃষককে শোষণ করে কে?" শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

"গণেশ-জননীর আহার।" শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য।

ভবিষ্যদ্বাণী—(ডঃ ধরের পত্নী সম্বন্ধে—"দেশ")

এই কৃতী মহিলাটি রসায়নে ডক্টর উপাধির জন্য গবেষণা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই ঐ উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইবেন। ভারতবর্ষে মহিলাদিগের ভিতর ইনিই প্রথম রসায়নে ডক্টর হইবেন। কালে যে ইনি এদেশের ম্যাডাম কুরী হইবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

—

মাল্! মাল্! শুধু মাল্! (ভবিষ্যৎ)

পা ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত নাই, দৃষ্টিরও তেমনি দুর্দ্দশা। শুধু মালের ছড়াছড়ি। সহরে যারা পড়ে রইল, তারা না জানি থাকবে কি করে। চলতি পথে পিছনের ভাবনা কেই বা ভাবে? মাল প্রবেশ হচ্ছে।...

—

সংসারের ব্যাসটানি

আমার অত্যন্ত কাছে ঘেঁসে এসে বেব্সি বলল—আচ্ছা! দুজনে যদি একেবারে একটা ফাঁকা গাড়িতে আজ যেতে পারি...তবে কেমন হয় বল দেখি? * * * না সত্যিই আজকার এই রাতটাকে ইচ্ছা করছে জীবনের একটা বিশেষ রাত করে নিতে! এর পরে—সংসারের ব্যসটানিতে প্রাণটা যদি কখনও হাঁপিয়ে ওঠে তখন এই রাত্রির স্মৃতিই দেবে আমাকে বেঁচে থাকবার মত সান্ত্বনা, উত্তেজনা।

—

গণনালয়

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করল—মহাশয়ের গণনালয়টা কোথায়? নিষ্প্রভ দৃষ্টিটা কোনরূপ বাগিয়ে বৃদ্ধ বক্র কটাক্ষে তাকালেন —গণিকালয় মানে?

সকলেই জ্যোতিষাচার্য্যের কথায় বিস্মিত হইল। বোঝা গেল শ্রবণশক্তিরও তার কিছু ঘাটতি আছে।

—আজ্ঞে গণিকালয় নয়, গণনালয়। ওঃ! কেন, সেই যে হেদুয়া পুকুরের ধারে মেয়েদের স্কুলের দরজায়।

—

খোলা চিঠি (খেয়ালী)

> দুর্গাদাস, কিন্তু আমি বলি তুমি এ প্রৌঢ় বয়সে আর নায়ক সেজোনা, তাতে তোমার এতদিনকার কষ্টার্জ্জিত সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তোমাকে এখন আমরা বয়স্থ লোকের ভূমিকায় বা "ভিলেন" রূপে দেখতে চাই।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি এখনও খোলা চিঠি পান নাই।

—

প্রতিভা ("নবশক্তি"-বুদ্ধদেব বসু)

> আমরা আমাদের প্রতিভাকে গোপন কোন পাপের মত পালন করি। রাস্তায় খবরের কাগজের কি সভাসমিতির লোক, তার কোন রকম উল্লেখ করলে কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠতে চায়।

আমরাও শুনিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

—

অভিভাষণ (রবীন্দ্রনাথ—"প্রদীপ"-এ মুদ্রিত)

> সেকস্‌পীয়র, বায়রণ, মেকলে, বর্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। * * *
>
> তখন অন্তঃপুরে বটতলার কাঁকে কাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই।

—

বৃহত্তর-বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

> বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখন যে জীবন সংগ্রামের সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে, ভবিষ্যতে

> বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য সেবার উত্তম যথেষ্ট প্রবল হইবে না। বাঙ্গালী-জীবনের সমস্যা হইতে তাহার সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে চলিবে না। জীবনধারার রূপই আমরা সাহিত্যে দেখিতে পাই, তাই সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে জীবনকে যে-সকল সমস্যা আজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার প্রতি আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

কিন্তু বাঙালী এখন আর মানুষ নহে, সে উদ্ভিদে পরিণত হইয়াছে। তাহার নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা নাই; সে যেখানে বাড়িয়া উঠে সেখানেই গোটাকত শাখা বিস্তার করিয়া পত্র প্রকাশ করিতে থাকে। এই পত্র প্রকাশই আপাতত বাঙালী-জীবনের সমস্যা। ইহার প্রতি অবহিত হওয়ার অর্থ আর একখানি কাগজ বাহির করা। সে বিষয়ে বাঙালীকে উস্কাইয়া দিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—

> বঙ্কিমকে আমরা হারিয়েছি মাত্র চল্লিশ বৎসর। এরি মধ্যে শুনতে পাচ্ছি, তাঁর উপন্যাসাদি নাকি আদর্শ ও নীতিমূলক, যা কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট রীতি নয়,—অর্থাৎ দোষদুষ্ট। তাতে প্রকৃত বস্তুর বা সাহিত্যের বিকাশ ঘটনা, সুতরাং দেশ কিছু পায় না। তাঁর নায়ক নায়িকারা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে পথ যে নিত, তাকে সে পথে তিনি নিয়ে যেতে পারেন নাই। অর্থাৎ তাঁর লেখার পশ্চাতে উদ্দেশ্যের প্রভাব প্রকট; Art for art's sake—এ নয়?

> স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নেই যে, শেষের ঐ ইংরেজী 'বয়েদ'টি আজো আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কেদারবাবু বোধ হয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের ঠিকানা জানেন না। অন্তত ধূর্জটীপ্রসাদের নিকট একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলেও উক্ত বয়েদটি বুঝিতে পারিতেন। এখনও সময় আছে।

—

অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় "তারুণ্যের জোর" আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের তারুণ্যের জোরে এখন আর তাঁহার তেমন আস্থা নাই মনে হইতেছে। উপদেশ বাণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ এবং বাণী-প্রস্থ দুইই বাঙালীর অবলম্বন। ইহা তাহার একরূপ পেশা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশোর্দ্ধের আর দরকার হয় না— তারুণ্য ভাঙাইয়া দুই চারিখানি বই ছাপাইতে পারিলেই বাণী বিলাইবার কাল উপস্থিত হয়। আর সব দেশে যৌবন-ধর্ম্মই জাতির কাম্য—তাহারা জড়ত্ব এবং স্থবিরত্বকে ভয় করে, কিন্তু আমাদের কাম্য, তারুণ্য। না হইলে মাসিকপত্র চালানো যায় না। যৌবন-ধর্ম্মে। আমাদের ভীতি, কেননা ইহা মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতে চায়। তারুণ্য চায় অপকর্ম্মের ক্ষেত্রে। তারুণ্য অর্থাৎ পাকামি। ইহাতে কোনো দায়িত্ববোধ থাকে না, যাহা খুশী করা যায়, তাই ত যত অকর্ম্মার দল তরুণ সাজিবার জন্য ব্যস্ত! সাহিত্যেও তারুণ্যের সাহিত্য —বিশুদ্ধ সাহিত্য নহে! ইংরেজিতে যেমন বিজ্ঞাপন, লিটারেচর; রেলোয়ে টাইম টেবল, লিটারেচর; তেমনি আমাদের দেশে তরুণ-লিটারেচর, ইহার জের এখনো মিটে নাই।

—

আই-সি-এস সম্প্রদায় কি সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো আসন না পাইয়া "তরুণ-সাহিত্যে" ভিড়িয়াছেন? পরস্পর পিঠ চুলকাইবার ভঙ্গি দেখিয়া ত ইহাই মনে হয়। কিন্তু আই-সি-সি-এস সম্প্রদায় তাঁহাদের যৌবন কাহাকে দান করিলেন? যৌবন না থাকিলে হয় বৃদ্ধ আর না হয় তরুণ, অর্থাৎ চিরশিশু। যৌবনের মন উন্মুক্ত, সে সত্যের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, মহৎ আদর্শ তাহাকে চঞ্চল করে; কিন্তু তরুণের আদর্শ কোথায়? সে অর্ব্বাচীন, সে অপগণ্ড, সে মূঢ়। ইহাও ভাল, কিন্তু এই তরুণ যদি হঠাৎ নিজের তারুণ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, যদি সে বলিতে আরম্ভ করে যৌবন কিছু না তারুণ্যই সব—কেননা সে সাহিত্য-মন্দিরকে urenal করিতে পারে—প্রাণ খুলিয়া মুখখিস্তি করিতে পারে—আর ইহাই ত প্রকৃত বিদ্রোহ, প্রকৃত জীবনধর্ম্ম! তাহা হইলে ইহার প্রতিকার কি?

—

তারুণ্যের জোর দেখুন—

এবার যদি সুধাও লীলাভরে
আমায় ভালোবাসো?
লবো তোমার একটি পাণি বুকে
যতই তুমি হাসো।
তনের বাণী তন সে বোঝে ঠিক
মনের বাণী মন
মনের বাণী বিমৌনতা আর
তনের পরশন। (লীলাময় রায়)

উর্দ্ধতন এবং অধস্তন সকলেরই বাণী শুনিতেছি। অধস্তনের বাণীই তারুণ্যের বাণী, ইহাই তাহার জোর।

—

করিতা বলিতে কি বুঝায় তাহা অনৈক কাব্যনীতির ছাত্র আমাদিগকে বুঝাইতে আসিয়াছিল। তাহার মত এই যে মানুষ তাহার কর্ম্মফল ভোগ করে, সুতরাং কবিতা যাহারা লেখে তাহাদেরও ইহা কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি কর্ম্মের ফল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্নদাশঙ্করের তারুণ্যের পরেই দিলীপকুমারের "পৌরুষ"! দিলীপকুমার সহজ বিনয়ের বশে ইহাকে পৌরুষ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন, আসলে ইহা অপৌরুষেয়। কারণ, মানুষের চৌদ্দ পুরুষে এরূপ লিখিতে পারে না—

হও অন্তরায় সে ফক্সনোদয়ে করকার অভিনন্দি'
তাই আফোটা কোরকদল মুদে, বাস—মুক্তির পথে বন্দী,
তুমি নহ কৃতজ্ঞ মর্ম্মে,
চাও হাতে হাতে ফল—কর্ম্মে,
আজো প্রকৃতির কাছে শিখিলেনা তাই—প্রতি ফুল নীলসন্ধী
কত কঙ্কর-জয়ে তবে উঠে রবি-সঙ্গমে সৌগন্ধী।

কিন্তু ফল যে হাতে হাতেই ফলিতে আরম্ভ করিল! আজীবন অপেক্ষা করিতে পারিব বলিয়া যে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট আমরা কথা দিয়াছিলাম!

কিন্তু দিলীপকুমারের মতে, আমরা নাকি আমাদের আত্মবিলাসী নির্ঝরকে আজ্ঞা দিয়াছি—

সদা স্বেচ্ছা-প্রণালী খুঁজিয়া
বাঁকি' চলিতে;

নির্ঝরকে সোজা চালানো যে কি কষ্ট তাহা যদি দিলীপকুমার জানিতেন তাহা হইলে আমাদের স্বেচ্ছা-প্রণালী অনুসরণকারী বক্রগতিকে তিনি বহুপূর্ব্বেই ক্ষমা করিতেন !

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্যের প্রথম চারিটি প্রশ্নের আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি। তাঁহার প্রশ্ন—

আকাশের ভাষা বুঝিতে কি পার নীড় নিবাসী ?
অমাবস্যার প্রাক্-সন্ধ্যার নীল আকাশ ?
নীরন্ধ্র নীলে যখনো ফোটেনি তারার হাসি,
আসন্ন নীল, প্রসন্ন নীল
অনন্ত নীল, অনন্য নীল
সে নীলের মাঝে মনের ভাষার পাও আভাস ?

উত্তর—১। না ২। ঈষৎ পারি ৩। না ৪। একটু পরিবর্ত্তন করিলে পাই। নীলের স্থলে শীল করিয়া কয়েকটা নাম একটু পরিবর্ত্তন করিলে দাঁড়ায়—আনন্দ শীল, প্রসন্ন শীল, অনন্ত শীল এবং অনন্যা শীল। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহাদের নিকট হইতে বহু টাকা ধার করিয়াছি, কাছে গেলেই মনের ভাষার আভাস সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি।

—

খেয়ালী (২৫শে পৌষ ১৩৪১) সংখ্যায় "রবীন্দ্রনাথ আর একবার" নামক একটি রচনা ছাপা হইয়াছে। উহার নীচে লেখা আছে, রেডিওতে পঠিত 'কথা'র সারাংশ। লেখকের নাম শ্রীশেফালেন্দু

বস্থ। লেখক চুরিবিদ্যায় এখনো পাকা হন নাই বলিয়া মনে হয়। পাকা হইলে ধরা পড়িবার এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন না। অন্যের লেখা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই নিজের নামে চালাইতে গেলে নানারূপ অসুবিধা আছে। নিজের নামটিও যে গোলমেলে। শেফাল+ইন্দু! আমরা রেডিও বক্তৃতা শুনি নাই, খেয়ালীতে ছাপার অক্ষরে পড়িয়া ধরিয়া লইতেছি রেডিওতে উহা পঠিত হইয়াছিল। চোরাই মাল হয়ত উভয় স্থানেই বিক্রয় হইয়াছে, হয়ত শেফাল+ইন্দু দুই পয়সা লাভ করিয়াছেন।

—

রেডিওতে যাঁহাদিগকে প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া হয় তাঁহাদের বিদ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া দেওয়া হয় কি? যে লোকটি অপরের লেখা চুরি করিয়া নিজ নামে চালায় তাহার বিদ্যার একটা খ্যাতি নিশ্চয়ই রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছায় নাই। কিন্তু কি ভাবে উক্ত শেফাল+ইন্দু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের অধিকারী হইল? ঐ প্রবন্ধটি গত ১৩৩৮ সালের পৌষ-সংখ্যা "বঙ্গলক্ষ্মী"তে "তোমায় করিগো নমস্কার" এই নামে প্রকাশিত হয়, উহার লেখক শ্রীপরিমল গোস্বামী।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশনের ক্যাটালগের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—

Gogonendranath Tagore	Not for sale
Abanindranath Tagore	Not for sale

M. K. Gandhi Rs. 50.
Dr. Rabindranath Tagore Rs. 35.

আমরা এরূপ মূল্যনির্দ্ধারণ সমর্থ করি না।

—

জিরাগু-সম্পাদক দুই তিন সংখ্যা কাগজ বাহির করিয়াই আত্মার দ্বৈত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। আত্মপ্রতিভা সম্বন্ধে এরূপ আত্মপ্রত্যয় ইতিপূর্ব্বে আমরা আর দেখি নাই। ইহা "দেখন"ও যেমন চমৎকার "ভাবন"ও তেমনি মধুর। দ্বিধাবিভক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর ক্রমশ ত্রিধা হইবেন এবং ত্রিধা হইতে ক্রমশ নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করিবেন এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তারুণ্যের জোর থাকিলে একদিকে জিরাগু অন্যদিকে অ্যাপেণ্ডিক্স—কিছুই অশোভন হয় না। জিরাগু-জনক ভূপেন্দ্রকিশোর লিখিতেছেন—

মোর মাঝে বাসা করে দুই জন—
আমি আর ভূপেন্দ্রকিশোর
আত্মা আর আত্মীয় দুজন
পুরুষ-প্রতিভা দুই নামে।

পুরুষটিকে আমরা দেখি নাই, প্রতিভার পরিচয় পাইলাম।

—

পরিচয়ের নানাপ্রকার রূপ আছে—তন্মধ্যে "ফলেন" পরিচয় সকল পরিচয়ের সেরা। কিন্তু এরূপ পরিচয় লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেননা ফল না বাহির হইতেই অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় বাহির হইয়া পড়ে। পরিচয় নামক একখানি ত্রৈমাসিকের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বে

কিছু পরিচয় ছিল, কিন্তু যাঁহারা চালক সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অন্য পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরম নিশ্চিন্তে পোষ্টেজ বাঁচাইতেছেন।

—

আমরা সে জন্য দমি নাই। ইতিমধ্যে অন্য পরিচয় লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালীদের জন্য "কলিকাতা পরিচয়" নামক একখানি ১৩৯ পৃষ্ঠার সচিত্র পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মূল্য লেখা আছে একটাকা মাত্র। ইহার নীচে আর একখানি পুস্তকের নাম এবং দাম লেখা আছে। পুস্তকের নাম "ধাই"—মূল্য পাঁচ সিকা। ইহা কাহার রচিত বা কি জন্য রচিত তাহার উল্লেখ নাই।

—

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন,—প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই পুস্তকখানি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন * * * শেঠ মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে তাঁহার পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ইহা করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। * * * এই পুস্তকখানি কলিকাতার এবং তাহার নাগরিকের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। যথেষ্ট সময় পাইলে এবং পুস্তক যথেষ্ট বৃহদায়তন করিতে পারিলে গ্রন্থকার ইহা পূর্ণতর করিতে

পারিতেন। ইহাতে যে-সব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহার জন্য সময়ের অল্পতা ও পুস্তকের আয়তন বহু পরিমাণে দায়ী। * *

—

কিন্তু সময়ের অল্পতা এবং পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট আয়তনে কি-জাতীয় ত্রুটি ঘটিতে পারে? আয়তন বাড়াইবার উপায় না থাকিলে অনেক জরুরি বিষয় বাদ পড়িতে পারে, এবং সময় অল্প হইলে প্রুফ দেখায় ভুল থাকিতে পারে। এ ত্রুটি নিশ্চয়ই ক্ষমার্হ। যদিও এরূপ ত্রুটি ঘটিলে, পরে এরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা যে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম তাহার সঙ্গে আয়তনের কোনো সম্পর্ক নাই। সময়ের আছে বটে, কিন্তু তাহা এই প্রকার: ধরুন কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য অনেকগুলি নূতন আইন প্রণয়ন করা দরকার। আইন-প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল প্রাইমারি স্কুলের তিনজন ছাত্রের উপর। তাহারা আইন করিল, এবং তাহা এই বলিয়া গৃহীত হইল যে যদিও এই আইনে অনেক গলদ আছে, কিন্তু তাহা নিতান্তই সময়াভাবের জন্য। অর্থাৎ যে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর সময় পাইলে বাছারা বড় হইয়া উপযুক্ত আইন রচনা করিতে পারিত, ইহারা সে সময় পায় নাই; নাগরিকগণ এজন্য ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

—

এরূপ অনুরোধ করিলে ক্ষমা না করিয়া থাকা যায় না। আমরাও ক্ষমাই করিলাম, কেননা প্রবাসী বাঙালীর জন্য আমরা যেটুকু করিয়াছি

তাহাই যথেষ্ট। সাহিত্যের জন্ত আমাদের দুর্ভাবনা থাকুক বা না-থাকুক প্রবাসী বঙ্গের জন্ত যে নাই ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের গ্রাম্য কোনো ধনী লণ্ডনে আসিলে 'বাঙাল' পাইয়া তাহাকে পাঁচজনে ঠকাইয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ করিয়া ছাড়িয়া দিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গদেশও অনেকটা এইরূপ ছিল। মফঃস্বলের বহু লোককে কলিকাতা আসিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়াছি। প্রবাসী-বঙ্গের তুলনায় বঙ্গদেশও অনেকটা তদ্বৎই দেখা যাইতেছে। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রবাসী-বঙ্গকে অনুরোধ করিয়া যে কলিকাতা-পরিচয় তাহাকে দান করিলেন তাহাতে সে কতখানি উপকৃত হইল, তাহা তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের জানা প্রয়োজন।

—

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে রচিত কলিকাতা পরিচয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছবি না থাকিয়া ভালই হইয়াছে, কেননা উহাতে অযথা খরচ বাড়িত—অপর পক্ষে, কলিকাতা পরিচয়ে প্রবাসী-বাঙালীগণ কলিকাতা বঙ্গীয় পরিষদের ছবির পরিবর্ত্তে নিজেদের ফোটোগ্রাফ পাইলেন ইহাও কম লাভের কথা নহে। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় ত ex-officio প্রবাসী বাঙালী, তাঁহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু প্রবাসীর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই এরূপ অপ্রবাসীও সুযোগ বুঝিয়া পরিচয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। সাহিত্য সম্মিলনের স্মারক হিসাবে যে পুস্তিকা মুদ্রিত হইল, সময়ের নিতান্ত অভাব এবং স্থানাভাববশত তাহাতে রেস্-কোর্স-এর-ছবি ছাপা হইয়াছে—কিন্ত সাহিত্য-পরিষদের ছবি ছাপা হয় নাই। সময়ের অভাববশত সংবাদ-ভাস্কর সম্পাদক

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখ নাই—কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনশিওর‍্যান্সের ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ছবি ছাপা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গলক্ষ্মী" কাগজে লিখিয়াছিলেন, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম ১৮শ শতাব্দীতে। তখন হইতে ইনি আমাদের স্মরণীয়।

—

কলিকাতা পরিচয়ে আরো যে সকল ত্রুটি স্থানাভাববশত ঘটিয়াছে তন্মধ্যে—"(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম্‌স্ কলেজে পাঁচ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন।" (৬১ পৃঃ)। ৬২ পৃঃ দেখিতেছি "ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়।...'প্রভাকর' নামে একখানি সুবৃহৎ মাসিকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ৬৮ পৃঃ কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাগজের নাম "হিন্দু ইন্টেলিজেন্স"—৭৫ পৃঃ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে সরকার '৭০০ টাকা বৃত্তি দিতেন'—৭৬ পৃঃ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের "মৃত্যু তারিখ ১৮০৬"।—১০৫ পৃঃ রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম ১৭৪৫, মৃত্যু ১৮৮৬।" (জীবিত কাল ১৪১ বৎসর !)—১০০ পৃঃ "মনোমোহন বসু "মধ্যস্থ" নামক সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক ও মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।"—৮৬ পৃঃ "প্যারিচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের প্রথম সম্পাদক।"—১০৬ পৃঃ, "ব্রাহ্ম-সভা"। ১১২ পৃঃ রামনিধি গুপ্তের

মৃত্যু তারিখ ১২৩৫ সাল (অর্থাৎ ১৮২৮) ১১৭ পৃঃ—মৃত্যুকালে লালাবাবুর বয়ঃক্রম "৪০ বৎসর"—১২৯ পৃঃ "হরুঠাকুরের মৃত্যু তারিখ ১২১৯ সাল"।

—

ইহার কোনোটাই ঠিক নহে। কিন্তু ঠিক ভাবে লিখিতে গেলে যে সময় প্রয়োজন তাহা হাতে ছিল না। তবু এরূপ বই প্রকাশের সার্থকতা আছে। ইহাতে লোক চিনিবার পক্ষে আমাদের বড়ই সুবিধা হয়। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়দ্বয় নিজেদের ফোটো ছাপা সম্বন্ধে যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অসাধারণ। শুধু এই টুকুর জন্যই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এবারে চরম সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নামক পুস্তকখানি "কলিকাতা পরিচয়" লিখিবার সময় যে কোনই কাজে লাগিল না এতৎসত্ত্বেও তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা ত্যাগ করেন নাই।

———

প্রাপ্তিস্বীকার ও অভিমত

স্পর্শের প্রভাব—উপন্যাস। কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। (পরে আলোচিত হইবে)

বাস্তবের দুপৃষ্ঠা—শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। গল্পের বই। প্রথম গল্পটিতে ২০৫টি আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন আছে; উহা ছাড়া লেখকের আর কোনো কৃতিত্ব নাই। গল্পগুলি অপাঠ্য।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।